আহ্‌বান

(মলফুযাত থেকে অনূদিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়:
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ ধর্ম’

(সূরা আলে ইমরান: ২০)

আহ্‌বান

(মলফুযাত থেকে অনূদিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়:

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

আহ্‌বান
(মলফুযাত থেকে অনূদিত)

গ্রন্থস্বত্ব	**ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.**
প্রকাশনায়	**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ** ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী** প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)
ভাষান্তর	**মৌলভী মোহাম্মদ** ভূতপূর্ব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
চলিতকরণ	**মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন**
১৭তম প্রকাশ	জানুয়ারি ২০১২
১৮তম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৩ (চলিত ভাষায় ১ম প্রকাশ)
সংখ্যা	৪০০০ কপি
মুদ্রণ	ইন্টারকন এসোসিয়েটস ৪৫/এ, নিউ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

AHBAN
Bangla Translation from Urdu
MALFOOZAT

আহ্‌বান
(মলফুযাত থেকে অনূদিত)

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian**
Promised Messiah & Imam Mahdi[as]

Translated into Bengali
Maulvi Mohammad
Ex. National Ameer, Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

17th Published in Bangladesh in January 2012

18th Published in Bangladesh in February 2023

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© **Islam International Publication Ltd.**

ISBN: 978-984-991-008-4

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

৩১ আগস্ট, ১৯০১ জনাব বাবু গোলাম মোস্তফা সাহেব, উজিরাবাদের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কাদিয়ান আগমন করেন। এ উপলক্ষ্যে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি তবলীগী বক্তব্য রাখেন। এ বক্তৃতা ১৯০৩ সালের আল হাকাম পত্রিকায় ১০ জানুয়ারি সংখ্যা থেকে নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ সাল পর্যন্ত মোট ৭টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুখনিঃসৃত বাণীর সংকলন মলফুযাত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৫৫ থেকে ৩৮৪ পৃষ্ঠায় (নব সংস্করণ: পুরনো মলফুযাতের চতুর্থ খণ্ডের শুরু এ প্রবন্ধ দিয়ে) ছাপা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ এ বক্তব্যের বাংলায় ভাষান্তর করেছেন তদানীন্তন ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। মরকযের সাথে যোগাযোগ করে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আহ্বান শীর্ষক পুস্তিকার উপরোক্ত সঠিক সূত্র (মূল তথ্য) সংগ্রহ করা হয়। বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে আমরা এটি চলিত ভাষায় প্রথমবারের মতো উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করছি। পুস্তিকাটি চলিতরূপ দান করেছেন জামা'তের একনিষ্ঠ সেবক মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব।

এছাড়াও পুস্তিকাটি প্রকাশনায় যে যেভাবে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

আব্দুল আউয়াল খান চৌ.

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

তারিখ: ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন-

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মাহ্দী-মিশকাত, কিতাবুল ইলম)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

হে দেশবাসী!

আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি ঈমান আনো

‘তিনি (আল্লাহ্) যা করেন সে বিষয়ে কারো প্রশ্ন করার অধিকার নাই; পরন্তু তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে’ (সূরা আল আম্বিয়া: ২৪)।

‘সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাকে মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহ্‌রূপে সৃষ্টি করছেন। তিনি কেন এরূপ করলেন কারো প্রশ্ন করার অধিকার নাই। কিন্তু মানুষকে প্রশ্ন করা হবে, কেন তারা তাঁর আজ্ঞা পালন করল না।’

‘তুমি সেই মহিমান্বিত মসীহ্ যার সময় নিষ্ফল হবে না। আমি ইচ্ছা করেছি যে, এ যুগে আমার এক খলীফা সৃষ্টি করব তাই এ আদমকে (হযরত আহমদকে) সৃষ্টি করলাম। তিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন এবং শরীয়তকে পুনঃস্থাপন করবেন।’

‘আল্লাহ্ তা’লা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূল বিজয়ী হবেন’ (ইলহাম, দ্র. তাযকেরা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ
মাহ্‌দীয়ে আখেরুজ্জামান
মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন:

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ

'তোমরা যখন তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্-মাহ্‌দী।' *(সুনামে ইবনে মাজা-বাবু খুরুজুল মাহ্‌দী)*

وَيُؤْمِنُ بِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ ,فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইমাম মাহদীকে পাবে, তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিবে।' *(কনযুল উম্মাল)*

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়আত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছে।' *(সহীহ্ মুসলিম)*

সূচীপত্র

১.	নতুন কথা শোনামাত্রই বিরোধিতা করা উচিত নয়	৯
২.	মিথ্যা সাব্যস্ত করতে ব্যগ্র হয়ো না	৯
৩.	প্রত্যেক একশত বছরে মুজাদ্দিদ	৯
৪.	হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)	১০
৫.	সংস্কারকের আবশ্যকতা কি আছে?	১১
৬.	সমাজের ভিতরকার অবস্থা লক্ষ্য করো	১১
৭.	বাইরের শত্রুর কথা চিন্তা করো	১২
৮.	খোদার সাহায্যের সময় আসে নি কি?	১৩
৯.	আমার দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়	১৪
১০.	হেফাযতের আবশ্যকতা	১৫
১১.	সংস্কারকের আবশ্যকতার প্রমাণ	১৬
১২.	সত্যের পূর্ণ প্রচার	১৭
১৩.	হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্য	১৮
১৪.	মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অস্বীকার করার পরিণাম	২১
১৫.	ক্রুশ ধ্বংস বলতে কী বুঝতে হবে?	২৪
১৬.	ধর্মের নামে যুদ্ধ করা হারাম	২৫
১৭.	তবে ‘ক্রুশ ধ্বংস’ করার অর্থ কী?	২৫
১৮.	হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু	২৬
১৯.	হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের লক্ষণ	২৯
২০.	নযুল শব্দটির ভুল অর্থ করো না	৩০
২১.	পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক	৩৫
২২.	কুরআন ও হাদীসের সত্যতা	৩৮
২৩.	মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে মীমাংসা করবেন?	৩৯
২৪.	সাতটি প্রমাণ	৪৪
২৫.	রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ	৪৬

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আহ্‌বান

নতুন কথা শোনামাত্রই বিরোধিতা করা উচিত নয়

উন্মুক্ত চিত্তে চিন্তা করে দেখ, বিষয়ের সকল দিকে দৃষ্টি রাখ এবং মনোযোগের সাথে সকল কথা শ্রবণ করো। এমন না করে কারো পক্ষে পুরাতন ধারণা বর্জন করা সম্ভব নয়। কোনো নতুন কথা শোনামাত্রই তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রস্তুত হওয়া অনুচিত। ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি খোদা তা'লার ভয় সামনে রেখে নিভৃতে ঐ বিষয়ের সকল দিক গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা একান্ত আবশ্যক।

মিথ্যা সাব্যস্ত করতে ব্যগ্র হয়ো না

আমি এখন যা বলতে ইচ্ছা করেছি, তা হালকা নজরে দেখার মতো একটি সামান্য ব্যাপার নয়। বিষয়টি অতি মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমার নিজের বানানো কথা নয়; স্বয়ং খোদা তা'লার কথা। যে ব্যক্তি এটা আগ্রাহ্য করার মতো দুঃসাহস দেখায়, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে অগ্রাহ্য করে না বরং খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-কে অগ্রাহ্য করে। তার এইরূপ অগ্রাহ্য করায় আমি মনে কোনো দুঃখ নেই না। অবশ্য সেই অর্বাচীন তার নির্বুদ্ধিতার ফলে খোদার ক্রোধ জাগাচ্ছে দেখে তার প্রতি আমার দয়া হয়।

প্রত্যেক একশত বছরে মুজাদ্দিদ

মুসলমান মাত্রই জানে এবং সম্ভবত কোনো লোকেরই একথা অজানা নাই যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

‘প্রত্যেক একশত বছরের মাথায় আল্লাহ্ তা’লা নিশ্চয় মুজাদ্দিদ পাঠাবেন। ধর্মের যে অংশে কোনো প্রকার অনাচার দেখা দিবে, তিনি সেই অংশের সংস্কার করবেন।’

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٠﴾

‘নিশ্চয় আমরা এই যিক্‌র (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী’ *(সূরা আল হিজর: ১০)*। আল্লাহ্ তা’লা তাঁর এ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মুজাদ্দিদ পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ্ তা’লার এ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী পেয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গিয়েছেন তদনুযায়ী ধর্মের সংস্কার ও সজীবতা সাধন করার জন্য বর্তমান শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক। অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হয়ে উনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ৩০ তম বছর চলছে, প্রকাশক) বছর চলে গিয়েছে। শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি ঘোষণা করার পূর্বেই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের উচিত ছিল অতিশয় আগ্রহের সাথে তাঁর অনুসন্ধান করা এবং তাঁর নিকট ‘আমি খোদা তা’লার প্রতিশ্রুত অনুযায়ী এসেছি- এই শুভ সংবাদ শোনার জন্য কায়মনে প্রস্তুত থাকা।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)

হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর উপর মুসলিম উম্মতের ওলী, দরবেশ ও আলেমদের দৃষ্টি যে নিবদ্ধ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের কাশ্‌ফ (দিব্যদৃষ্টি), রুইয়া (সত্যস্বপ্ন) ও ইলহামের (ঐশীবাণী) ইঙ্গিত এই যে, হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে সেই মহান প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসবেন, যাঁকে হাদীসের গ্রন্থসমূহে মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) উপাধি দেয়া হয়েছে।

وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থাৎ ‘ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোনো মাহদী নাই’। (যাঁর আসার কথা ছিল, তিনিও নির্দিষ্ট সময়েই এসেছেন। কিন্তু তাঁর ডাকে সাড়া দেয়ার লোক অল্পই দেখা গিয়েছে)। *(ইবনে মাজা, বাব ফি শিদ্দাতিয্ যামান)*

ফলকথা, প্রত্যেক একশত বছরের মাথায় যে একজন মুজ্জাদ্দিদ আসেন একথা নতুন নয় বা লোকের অজানা নয়। আল্লাহ্ তা’লার এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী

বর্তমান শতাব্দীতেও মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক ছিল। অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হয়ে এখন উনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ৩০ বছর চলছে প্রকাশক) বছর চলে গিয়েছে।

সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে কি?

এখন এ সমস্যার আরেকটা দিক দেখা আবশ্যক। ইসলামের এখন এমন কোনো সংকট উপস্থিত হয়েছে কি, যার জন্য এখন একজন সংস্কারক আসা আবশ্যক? এ বিষয়ে চিন্তা করলে পরিষ্কার দেখা যায়, এখন ইসলামের ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই সংকট উপস্থিত হয়েছে।

সমাজের ভিতরকার অবস্থা লক্ষ্য করো

ইসলামের ভিতরকার অবস্থা এই যে, প্রকৃত তওহীদের (একত্ববাদ) স্থলে অসংখ্য প্রকারের শিরক-বেদাতের সৃষ্টি হয়েছে এবং পুণ্যকাজের স্থলে কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা মাত্র বিরাজ করছে। পীর পূজা ও কবর পূজা এতদূর পৌঁছেছে যে, তাকে একটা নতুন শরীয়ত (বিধান) বলা যেতে পারে। আমার দাবি কি, তা না বুঝেই লোকে বলে যে, আমি নবুয়্যতের দাবি করেছি! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তারা নিজের ঘরের কথা ভেবে দেখে না। নবুয়্যতের দাবি তো তাঁরাই করেছেন যাঁরা এরূপে নতুন শরীয়ত সৃষ্টি করেছেন। সাজ্জাদনশীন ও গদ্দীনশীন পীর সাহেবান তাঁদের মুরীদদেরকে যে–সব 'দরূদ' ও 'অযিফা' শিক্ষা দেন সেগুলি কি আমার রচিত? আমি হযরত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শরীয়ত ও সুন্নতের ওপর চলি এবং তার বিন্দুমাত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি করাকে কুফর বিবেচনা করি।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই এখন অসংখ্য প্রকারের বেদাত নানা রঙে দেখা দিয়েছে। খোদার ভয় এবং মানসিক পবিত্রতা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। এর প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোর বিপদ সহ্য করেছেন। একমাত্র আল্লাহ্‌র নবী ব্যতীত এরূপ কষ্ট সহ্য করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আজ তাকওয়া ও তাহারাতের (পবিত্রতার) অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। জেলখানায় গিয়ে দেখ, দুবৃত্তের সংখ্যা কাদের বেশি। পরস্ত্রী গমন, মদ খাওয়া, পরের সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি দুষ্কার্য এত বৃদ্ধি পেয়েছে যেন খোদা বলে কেউ নেই। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে–সকল অনাচার দেখা যায়, তার আলোচনা

করলে একটি বৃহৎ পুস্তক হয়ে যাবে। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এক এক করে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা বিচার করলে নিশ্চয় এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যে, কুরআন করীমের মূল উদ্দেশ্য যে তাকওয়া (খোদাভীতি) ও তাহারাত (পবিত্রতা) ছিল, যে তাকওয়া ও তাহারাত যাবতীয় সম্ভ্রমের মূল ও শরীয়তের সোপান ছিল, তা বিলুপ্ত হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের উৎকর্ষতা ছিল মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য বুঝার মাপকাঠি। তা ভালো থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু তা অতি হীন ও জঘন্য হয়ে পড়েছে।

বাইরের শত্রুর কথা চিন্তা করো

বাইরের বিপদ লক্ষ্য করো। সকল সম্প্রদায়ই ইসলামের বিনাশ সাধনের জন্য সচেষ্ট আছে, বিশেষতঃ খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ইসলামের পরম শত্রু। মিশনারী ও পাদরীদের যাবতীয় চেষ্টার লক্ষীভূত বিষয়মাত্র একটি– যেভাবেই হোক এবং যতদূর সম্ভব ইসলামকে নির্মূল করতে হবে আর যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম বহু জীবন উৎসর্গ করেছে তার বিনাশ সাধন করতে হবে এবং জগদ্‌বাসী যাতে যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে ও তার 'রক্তদানে' বিশ্বাসী হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। 'রক্তদান' বা প্রায়শ্চিত্তবাদ- অসংযত, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্মদাতা। তার প্রচার করে পাদরীরা খোদার ভয়, হৃদয়ের শুচিতা ও জীবন নষ্ট করছে। এভাবে তারা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

খ্রিষ্টান পাদরীরা তাদের এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করে থাকে। দুঃখের সাথে বলতে হয়, তারা লক্ষাধিক মুসলমানকে খ্রিষ্টান করেছে। এতদ্‌ব্যতীত আরো বহু মুসলমান আছে যাদের কোনো ধর্ম নেই। চালচলন, কথাবার্তা ও বেশভূষায় তারা খ্রিষ্টানী প্রভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। যুবকদের মধ্যে এক সম্প্রদায় নতুন জীবে পরিণত হয়েছে। তাদের জন্ম হয়েছে মুসলমান গৃহে; কিন্তু কলেজের শিক্ষা লাভ করে খোদার কালামের (বাণী) পরিবর্তে তারা দর্শন ও বিজ্ঞানের সমাদর করে এবং তাকেই বেশি মূল্যবান ও আবশ্যকীয় বিবেচনা করে। তাদের বিচার বিবেচনায় ইসলাম ধর্ম আরবের অসভ্য লোকদের জন্যই উপযুক্ত ছিল।

এ সকল দুরবস্থা যখন দেখি বা শুনি, অন্যের কথা বলতে পারি না, আমার মনে বড়ো আঘাত লাগে। আজ ইসলাম এমন দুরবস্থায় নিপতিত হয়েছে এবং মুসলমান সন্তানদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তারা ইসলামকে তাদের

রুচিবিরুদ্ধ মনে করছে। আর এক শ্রেণির লোক আছে, যারা ইসলামী বিধি-নিষেধের বাইরে গিয়ে হালালকে (বৈধ) হারাম (অবৈধ) করে নি বটে কিন্তু খ্রিষ্টানী চালচলন ভালোবাসে। তারা খ্রিষ্টান ধর্মের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে।

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামের ভিতরকার অবস্থায় বাইরের ঐসকল বেদাত ও শিরকপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ জুটছে এবং এ সকল বিপদ উপস্থিত হয়েছে। বিশেষতঃ খ্রিষ্টধর্ম যে সকল বিপদ ঘটিয়েছে তা-তো আছেই। এমন এক সময় ছিল, যখন ইসলামের একটি লোক অন্য ধর্মে চলে গেলে মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্যের উদ্ভব হতো, এখন ধর্মত্যাগীর সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে কোনোই চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

খোদার সাহায্যের সময় কি আসে নি?

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ সব কথা সামনে রেখে চিন্তা করে দেখুন, এখন খোদা তা'লার বিশেষ শক্তি দেখাবার সময় এসেছে কিনা?

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٠﴾

আয়াতে 'ইসলামকে রক্ষা করব' বলে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, তা পূর্ণ হওয়ার সময় আসে নি? এখনও যদি আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য ও শক্তি প্রকাশের সময় না এসে থাকে, তবে ঐ সময় কখন আসবে, তা কেউ আমাকে বলে দিবেন কি? একদিকে প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহ ঘোষণা করছে যে, ইসলামের সপক্ষে ঐশী শক্তি ও সাহায্য প্রকাশের উপযুক্ত সময় এসেছে। অন্যদিকে শতাব্দীর শিরোভাগ উপস্থিত হয়ে সন্দেহাতীতরূপে প্রকাশ করছে যে, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর মারফত আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ পাঠাবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তদনুযায়ী কোনো মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক। এয়োদশ শতাব্দী শেষ হয়ে এখন ঊনিশ বছর (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ৩০ বছর চলছে– প্রকাশক) চলে গিয়েছে। এ সকল আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও এখনও যদি মুজাদ্দিদ না এসে থাকেন খোদার ওয়াস্তে চিন্তা করে দেখুন, তাহলে ইসলামে আর কি অবশিষ্ট রইল? এরূপ হওয়া কি–

وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

('আমরাই এর রক্ষক') বলে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার বিরোধী হবে না? এতে কি মুজাদ্দিদের আগমন সংক্রান্ত হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হবে না? এ থেকে কি এই কথা প্রমাণিত

হবে না যে, ইসলামের ওপর বিপদ আসলে খোদা তা'লা তার জন্য স্বীয় প্রতাপ দেখান না?

আমার দাবি স্বতন্ত্র রেখে এখন এ সকল কথা চিন্তা করো এবং আমাকে উত্তর দাও। আমাকে মিথ্যাবাদী বললে তোমাকে ইসলাম শূন্য থেকে হবে। আমি সত্যিই বলছি যে, কুরআন শরীফের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ধর্মের সাহায্য করেছেন এবং হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। ঠিক যখন আবশ্যক হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রসূলে করীম (সা.)-এর দেয়া শুভ-সংবাদ মোতাবেক আল্লাহ্ তা'লা এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বাণী সত্য। বড়োই হৃদয়হীন সে ব্যক্তি, যে এ বাণীকে মিথ্যা মনে করে।

আমার দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়

বর্তমান শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হয়েছি বলে আমার যে দাবি, তা সহজেই বুঝা যায়। আমি জোরের সাথে বলছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মা'মুর (আদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক) করেছেন। আমার এ দাবির পর বাইশ (বর্তমানে ১২০-প্রকাশক) বছরের বেশি সময় অতীত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময় ধরে আমি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য পাচ্ছি। তোমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এটা যথেষ্ট। কারণ অনাচার দূর করব বলে আমি যে মুজাদ্দিদ হবার দাবি করেছি, তা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সাব্যস্ত। আজ যারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে বস্তুত তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে। আমার স্থলে আর কাউকে ধর্ম-সংস্কারকরূপে না দেখিয়ে দিয়ে আমাকে মিথ্যাবাদী বলার কোনো অধিকার তাদের নেই। কারণ সর্বত্র অনাচার দেখা দিয়েছে এবং যুগের অবস্থা বলে দিচ্ছে যে, ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব আবশ্যক। কুরআন শরীফ সাক্ষ্য দেয় যে, এমন অনাচারের সময় তার হেফাযতের জন্য ধর্ম সংস্কারক এসে থাকেন। হাদীস বলে দেয় যে, প্রত্যেক একশত বছরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসেন।

সুতরাং যখন ধর্ম সংস্কারের আবশ্যকতা আছে, ধর্মের সংস্কার ও হেফাযতের বিধান আছে, তখন এ আবশ্যকতা ও বিধান অনুযায়ী যিনি এসেছেন, তাঁকে গ্রহণ না করার পথ মাত্র দু'টি– হয় অন্য কোনো সংস্কারক দেখিয়ে দিতে হবে, আর না হয় কুরআন ও হাদীসের এ সমুদয় বাণীকে মিথ্যা বলতে হবে।

হেফাযতের আবশ্যকতা

এমন লোকও দেখা যায়, যারা বলে থাকে যে, ইসলামের হেফাযতের কোনো আবশ্যকতা নেই। এরা মারাত্মক ভুল করছে। দেখ, এক ব্যক্তি বাগান রচনা করে বা ঘর তৈরি করে, সে কি ঐ বাগান বা ঘরের যত্ন নেয় না এবং শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে না? অন্ততঃপক্ষে এটা কি তার কর্তব্য নয়? বাগান রক্ষা করার জন্য তার চারদিকে বেড়া দেয়া হয়, আগুন থেকে ঘরকে বাঁচাবার জন্য কত নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করা হয় এবং বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য তার সংলগ্ন করা হয়। এ সমুদয় ব্যাপার থেকে প্রকাশ পায় যে, হেফাযত করা মানব-প্রকৃতির অঙ্গীভূত একটি ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষে স্বীয় ধর্মের হেফাযত করা কি সংগত ব্যাপার নয়? নিশ্চয় তিনি স্বীয় ধর্মের হেফাযত করেন এবং প্রত্যেক বিপদের সময় তাকে রক্ষা করেন। এখন ইসলামের হেফাযতের আবশ্যকতা আছে বলে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

যুগের অবস্থা ও আবশ্যকতা যদি অনুমোদন না করত, তবে হেফাযতে সন্দেহ থাকত বা হেফাযতের আবশ্যকতা অস্বীকার করা সম্ভব হতো। ইসলামের বিরুদ্ধে কোটি কোটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। পাদরীরা প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে ও প্রতি মাসে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন ও পত্রিকা প্রকাশ করছে তার তো ইয়ত্তাই নেই। নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ (সা.) তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁর সহধর্মিণীদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের ইসলামত্যাগী খ্রিষ্টানরা যে সকল গালি প্রচার করেছে, তা সমুদয় একত্র করলে বহু লাইব্রেরী পূর্ণ হবে এবং এ সকল পুস্তক যদি পর পর সাজিয়ে দেয়া যায়, তবে এদের বিস্তার বহু ক্রোশ ব্যাপী হবে। এমাদুদ্দিন, সফর আলী ও শায়েখ প্রমুখ খ্রিষ্টানরা যে শ্রেণির লেখা প্রকাশ করেছে, তা কারো অজানা নেই। এমাদুদ্দিনের লেখা যে মারাত্মক রকমের তা অনেক ন্যায়পরায়ণ খ্রিষ্টান পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। লক্ষ্ণৌ থেকে 'শামসুল আখবার' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এমাদুদ্দিনের কোনো কোনো পুস্তক সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা এ অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, ভবিষ্যতে যদি এ দেশে আবার কখনো বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তবে এ শ্রেণির লেখার ফলেই হবে। এরূপ অবস্থায়ও বলা হয় যে, ইসলামের ক্ষতি হয়েছে কোথায়? এ শ্রেণির উক্তি তারাই করতে পারে যাদের ইসলামের সাথে প্রাণের সম্বন্ধ বা মমতা নেই; অথবা অন্ধকার হুজরায় জীবন যাপন করার ফলে যারা বাইরের জগতের কোনো সংবাদ রাখেন না। এরূপ লোক যদি থাকে, তাদেরকে অক্লেশে গণনার বাইরে রাখা যেতে পারে। পক্ষান্তরে যাঁদের অন্তরে জ্যোতিঃ আছে, ইসলামের সাথে

যাঁদের সম্বন্ধ ও মমত্ববোধ আছে, যাঁরা যুগের সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করবেন যে, বর্তমান যুগ একজন বিরাট মহাপুরুষের আগমনের উপযুক্ত সময়।

সংস্কারকের আবশ্যকতার প্রমাণ

ফলকথা, বর্তমান সময়ে আমার আদিষ্ট-সংস্কারক হবার বহু প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ ইসলামের ভিতরকার অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ বাইরের শত্রুর প্রবলতা। তৃতীয়তঃ একশত বছরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসার হাদীস। চতুর্থতঃ কুরআন শরীফের আয়াত:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٠﴾

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা এই যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী' *(সূরা আল হিজর: ১০)*।

পঞ্চম প্রমাণ, সূরা নূরের আয়াতে 'এস্তেখলাফ'। এ প্রমাণটি এখন আমি দিব। আয়াতটি এই:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۪

'তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন' *(সূরা আন নূর: ৫৬)*। এ আয়াতে-এস্তেখলাফ অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে যাঁরা খলীফা হবেন, তাঁরা পূর্ববর্তী যুগসমূহের খলীফাদের তুল্য হবেন।

কুরআন শরীফের অন্যত্র মহানবী (সা.)-কে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যথা–

إِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ
اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٦﴾

‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি এক রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেভাবে ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম একজন রসূল’ (সূরা আল মুয্যাম্মেল: ১৬)। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী হযরত রসূলে করীম (সা.) হযরত মূসা (আ.)-এর তুল্য ছিলেন। এ আয়াতে সাদৃশ্য বুঝাবার জন্য যেমন সাদৃশ্যবোধক كَمَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তদ্রুপ সূরা নূরের আয়াতে এস্তেখলাফেও كَمَا শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এটা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের সাথে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর অনুসারীদের পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর শেষ খলীফা ছিলেন। তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেছিলেন। উল্লিখিত উপমা অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মহানবী (সা.)-এর অন্ততপক্ষে এমন গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট একজন খলীফা আসা আবশ্যক, আদর্শ ও আত্মিক অবস্থায় হযরত ঈসা (সা.)-এর সাথে যাঁর তুলনা করা হবে। আল্লাহ্ তা’লা যদি এ বিষয়ে আর কোনো প্রমাণ না দিতেন বা সহায়তা না করতেন, তাহলেও এ উপমা অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীতে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর তুল্য ব্যক্তির আগমন স্বতই আবশ্যক। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা এ উপমার শুধু অনুমোদন ও সহায়তা করেই ক্ষান্ত হন নি, পক্ষান্তরে এ কথাও প্রমাণ করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর উপমায় হযরত রসূলে করীম (সা.) শুধু হযরত মূসা (আ.) থেকেই শ্রেষ্ঠতর নন, বরং তিনি নবীদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.) যেমন নিজে কোনো নতুন ধর্মবিধান নিয়ে আসেন নি, মাত্র তওরাত পূর্ণ করতে এসেছিলেন, তদ্রুপ মুহাম্মদী ঈসা (আ.)-ও নিজে কোনো নতুন বিধান নিয়ে আসেন নি, কুরআনের শিক্ষাকে সজীব করার জন্য এবং ঐ অর্থে তা পূর্ণ করার জন্য এসেছেন, যাকে ‘তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত’ বা সত্যের পূর্ণ প্রচার বলা হয়।

সত্যের পূর্ণ প্রচার

‘তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত’ বা সত্যের পূর্ণ প্রচার সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.)-এর ওপর ইসলাম ধর্ম পূর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও তাঁর ওপর পূর্ণ হয়েছিল। ধর্মের এ পূর্ণতা ও আল্লাহ্‌র

অনুগ্রহের এ পূর্ণ বিকাশের দু'টি অংশ আছে। প্রথম অংশের নাম 'তকমীলে হেদায়াত' বা ধর্মের বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা। দ্বিতীয় অংশের নাম 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা ধর্মের পূর্ণ প্রচার। 'তকমীলে হেদায়াত'; বা বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা, মহানবী (সা.)-এর প্রথম আগমনে সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' তাঁর দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণ হবে। সূরা জুমুআর যে আয়াত وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ এসেছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর আত্মিক প্রভাবে আরেকটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। এটা থেকে অনুমান করা যায় যে, 'বুরূজী রঙে' মহানবী (সা.) আবার আসবেন। অর্থাৎ তাঁর আত্মিক শক্তি অন্য কোনো মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যাবে। এখন এরূপই হয়েছে। বস্তুতঃ বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণ প্রচারের যুগ। এর একটি লক্ষণ এই যে, প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণ হয়েছে। ছাপাখানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থা, রেলগাড়ী, জাহাজ এবং সংবাদপত্র আজ সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মতো করে দিয়েছে। এ সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুতঃ মহানবী (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পূর্ণ প্রচার সম্ভবপর হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন, 'আমি তওরাত পূর্ণ করতে এসেছি'। তদ্রুপ আমি বলছি, 'ইসলামের পূর্ণ প্রচার আমার অন্যতম কাজ'।

হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্য

হযরত ঈসা (আ.)-এর সময় যে–সব বিপদ দেখা দিয়েছিল, বর্তমান সময়েও সেসব বিপদ দেখা দিয়েছে। ইহুদীদের ভিতরকার অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা তওরাতের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেছিল। তার পরিবর্তে তারা তালমুদ (ইহুদীদের হাদীসগ্রন্থ) এবং তাদের আলেমদের কথার ওপর বেশি নির্ভর করত। বর্তমান যুগের মুসলমানদেরও এ অবস্থা। তারাও আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে পরিত্যাগ করেছে এবং তার পরিবর্তে রেওয়ায়াতে বা কেস্‌সা কাহিনীর ওপর বেশি জোর দিয়েছে। এতদ্‌ব্যতীত শাসনতন্ত্রের দিক দিয়েও একটা সাদৃশ্য আছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর সময় ছিল রোমীয় শাসন। বর্তমানে তেমনি ইংরেজ শাসন। ন্যায়পরায়ণতার জন্য এ উভয় সাম্রাজ্যই বিখ্যাত। ইতিপূর্বে বলেছি যে, ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেছিলেন এবং আমি এসেছি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে। আরেকটি ব্যাপার আছে যা এই সাদৃশ্যকে পূর্ণ করে দেয়। হযরত ঈসা (আ.) নৈতিক শিক্ষার উপর বেশি জোর দিতেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর প্রচারিত জিহাদ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। হযরত ঈসা (আ.) তা সংশোধন করেছিলেন। ধর্মের জন্য তিনি কখনো অস্ত্র ধারণ করেন নি। এ প্রকারে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্যও নির্দিষ্ট ছিল যে, ব্যবহারিক জীবনে তিনি ইসলামের শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ফল দেখিয়ে তার সৌন্দর্য স্বপ্রমাণ করবেন। ইসলামের বিরুদ্ধেও অপবাদ আছে যে, ইসলাম অস্ত্রবলে প্রচারিত হয়েছে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সময় এ আপত্তি সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হবে। কারণ তিনি ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করবেন তার জীবন্ত ফল দেখিয়ে। এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, আজ এ উন্নতির যুগে যখন ইসলামের পবিত্র শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ফল দেখা যাচ্ছে, তখন অতীতের সকল সময়ই তার ফল শুভ ও মঙ্গলময় ছিল। কারণ, এটি একটি জীবিত ধর্ম। এ কারণেই হযরত রসূলে করীম (সা.) মসীহ্ মাওউদ (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীতে একথাও বলেছেন যে, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন:

يَضَعُ الْحَرْبَ

এখন এ সমুদয় প্রমাণ একযোগে চিন্তা করে দেখ, বর্তমান সময়ে ঐশী মহাপুরুষের আগমন আবশ্যক কি-না? এ কথা যখন মেনে নেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক একশত বছরের মাথায় একজন মুজাদ্দিদের আগমন আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে রসূলে করীম (সা.)-এর সাদৃশ্য যখন এক নিশ্চিত ব্যাপার, তখন এ সাদৃশ্য পূর্ণ করার জন্য বর্তমান শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দিদ হবেন, মর্যাদায় তাঁর 'মসীহ্' [সংস্কারক (আ.)] হওয়া আবশ্যক। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মূসা (আ.) থেকে চৌদ্দশত বছরের মাথায় এসেছিলেন এবং বর্তমানে রসূলে করীম (সা.)-এর পর চৌদ্দ শতাব্দী চলছে। (বর্তমান পনের শতাব্দী– প্রকাশক) 'চৌদ্দ' সংখ্যাটির মধ্যে যেন একটি গুপ্ত রহস্য রয়েছে। চান্দ্র মাসে চৌদ্দ তারিখের চাঁদই পূর্ণচন্দ্র বলে।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ

'এবং (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। *(সূরা আলে ইমরান: ১২৪)*

আল্লাহ্ তা'লা এ কথার প্রতি একটা ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ এক 'বদর' ছিল রসূলে করীম (সা.)-এর সময়, যখন মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য থাকা

সত্ত্বেও তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। আরেক 'বদর' এ চতুর্দশ শতাব্দীতে। এখন মুসলমানদের অবস্থা অতি শোচনীয়। মোটের ওপর এ সমুদয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে এ কথাও আছে যে, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের সময় পৃথিবী 'জোর-যুলুমে' পূর্ণ হবে। এখানে জোর-যুলুমের এ অর্থে নয় যে, তখন গভর্নমেন্ট অত্যাচারী হবে। যারা এরূপ অর্থ করে, তারা মারাত্মক ভুল করছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র সময়কার গভর্নমেন্টের ন্যায়বান ও শান্তিপ্রিয় হওয়া আবশ্যক। আমি আল্লাহ্ তা'লার শোক্‌র (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করছি যে, তিনি আমাদেরকে এমন ন্যায়বান ও শান্তিপ্রিয় গভর্নমেন্ট দিয়েছেন, যার তুলনা পৃথিবীর আর কোনো গভর্নমেন্টের সাথে হতে পারে না। হযরত ঈসা (আ.)-এর সময় রোমীয় গভর্নমেন্ট ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট রোমীয় গভর্নমেন্ট থেকে বহুগুণে বেশি ন্যায়বান। পাদরী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেব যখন আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছিলেন, তখন ক্যাপ্টেন ডগলাস জিলা গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার।

এতে অনেকের মনে আশঙ্কা হয়েছিল কিন্তু এই ন্যায়বান বিচারক প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে ফেললেন এবং সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই মোকাদ্দমা কয়েকজন হীন লোকের ষড়যন্ত্রের ফলমাত্র। ক্যাপ্টেন ডগলাস এখন দিল্লীর ডেপুটি কমিশনার। এই অনুপম ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় থাকবেন। বস্তুতঃ এটা গভর্নমেন্টের মাত্র একজন কর্মচারীর উদাহরণ। এরূপ হাজার হাজার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। হাদীসে যে জোর-যুলুমের কথা আছে, এর প্রকৃত অর্থ এই যে, ঐ সময় পৃথিবী শিরকে পূর্ণ হবে। লক্ষ্য করে দেখ, বর্তমান যুগে পুতুল পূজা, ক্রুশ পূজা, কবর পূজা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের পূজা পার্বণ হচ্ছে, আর যিনি সত্য সত্যই আমাদের উপাস্য খোদা তাঁর উপাসনা পরিত্যক্ত হয়েছে।

এখন সুধীবৃন্দ এসব কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, আমার কথাগুলি কি ভাসা ভাসা চোখ বুলিয়ে ছেড়ে দেয়ার মতো; নাকি ভালোভাবে বুঝার বা অনুধাবন করার উপযুক্ত? আমার দাবি কি শতাব্দীর শিরোভাগে নয়? শতাব্দীর শিরোভাগ যখন এসেছে, তখন আমি না আসলেও আর কেউ আসতেন। বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের তাঁকে অনুসন্ধান করা উচিত। শতাব্দীর শিরোভাগ অতিক্রম করে এখন প্রায় বিশ বছর (বর্তমানে পঞ্চদশ

শতাব্দীরও ৩০ বছর চলছে– প্রকাশক) চলে গিয়েছে, এতে তাদের আরো বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া আবশ্যক। বর্তমান যুগের অনাচারও এ কথা ঘোষণা করছে যে, এর সংশোধনের জন্য একজন সংস্কারকের আগমন একান্ত আবশ্যক। খ্রিষ্টানরা দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের একশেষ করেছেন। তাদের প্রভাব মুসলমান সন্তানদের ওপর এতদূর হয়েছে যে, তাদেরক দেখলে মুসলমান সন্তান বলেই মনে হয় না। আর সব কথা ছেড়ে দাও, ক্রুশের এই অনাচার দূর করার জন্য যিনি আসবেন, তাঁকে কি উপাধি দেওয়া হবে? এই অনাচার যিনি দুর করবেন, হাদীসের ভাষায় তাঁকে নিশ্চয় يَكْسِرُ الصَّلِيبَ বা ক্রুশ ধ্বংসকারী বলতে হবে। এটা আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উপাধি।

কুরআন হাদীসে নানাভাবে নানা রঙে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সংবাদ দেয়া হয়েছে। এটা খুব ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। কারণ সামান্য পরিমাণ বুঝা আর মোটেই না বুঝা, উভয়ই সমান। কিন্তু যে ব্যক্তি উত্তমরূপে বুঝবে, তাকে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়। সুতরাং আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এ বিষয়টি বুঝার জন্য খুব মনোযোগসহকারে চিন্তা করুন। এ বিষয়টিকে দৈনন্দিন ছোটখাটো বিষয়গুলির মতো মনে করবেন না। এর সম্পর্ক ঈমানের সাথে, বেহেশত-দোযখ এ কথার সাথে সংযুক্ত।

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অস্বীকার করার পরিণাম

আমাকে অগ্রাহ্য করায় বস্তুত আমাকে অগ্রাহ্য করা হয় না, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অগ্রাহ্য করা হয়। যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলার পূর্বেই সে খোদাকে মিথ্যাবাদী (মায়াযাল্লাহ্) বলে। কারণ সে মুসলমান সমাজের দারুণ অনাচার ও ইসলামের শত্রুদের অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি দেখতে পায়, অথচ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ﴿١٠﴾

‘নিশ্চয় আমরা এই যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী’ বলে আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষ থেকে এর প্রতিকারের কোনো বিশেষ ব্যবস্থা দেখতে পায় না। আবার সে আয়াতে ‘এস্তেখলাফে’ দেখতে পায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মতের (অনুসারীদের) ন্যায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যেও খলীফা করবেন বলে আল্লাহ্ তা’লা প্রতিশ্রুতি করেছেন; কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি তিনি পূর্ণ করেন নি

(মায়াযাল্লাহ্), কারণ বর্তমান সময়ে এ উম্মতের কোনো খলীফা নাই। শুধু এ পর্যন্তই নয়। তাকে এ কথাও বলতে হবে যে, কুরআন শরীফে হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে যে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে, তা ঠিক নয় (মায়াযাল্লাহ্), কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন 'মসীহ্' (আ.) এসেছিলেন। এ তুলনা বজায় রাখতে হলে এ উম্মতেও বর্তমান শতাব্দীতে (হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী) একজন মসীহ্ (আ.)-এর আগমন আবশ্যক। এভাবে কুরআন শরীফের যে আয়াতে

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ

['এবং (তিনি তাকে আবির্ভুত করবেন) তাদের মধ্য থেকে অন্যদের মধ্যেও যারা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি' *(সূরা আল জুমুআ: ৪)*।] বলে মহানবী (সা.)-এর এক বুরুজের সংবাদ দেয়া হয়েছে তা-ও সে মিথ্যা বলতে বাধ্য হবে। এভাবে তাকে কুরআন শরীফের আরো বহু আয়াত অস্বীকার করতে হবে। উপরন্তু আমি দাবির সাথে বলছি যে, তাকে 'আলহামদু' থেকে 'আন্নাস' পর্যন্ত সমস্ত কুরআনকে মিথ্যা বলতে হবে।

আবার চিন্তা করে দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কি সহজ ব্যাপার? এটা আমার মনগড়া কথা নয়। খোদা তা'লার শপথ করে বলছি যে, এটাই সত্য কথা। যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে পরিত্যাগ করে, মুখে বলুক বা না বলুক, নিজের কার্যের দ্বারা সে সমস্ত কুরআনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং খোদাকে পরিত্যাগ করে। আমার একটি ইলহামেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে।

ইলহামটি হলো, اَنْتَ مِنِّيْ وَ أَنَا مِنْكَ

(অর্থাৎ তুমি আমা থেকে প্রকাশিত এবং আমি তোমা দ্বারা প্রকাশিত) নিশ্চয় আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় খোদাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। আর আমাকে সত্য বলে গ্রহণ করায় খোদাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা বস্তুত আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা নয়; এতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে সাহস করে, তার পক্ষে মনে মনে চিন্তা করা ও বিবেক বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য যে, সে কাকে মিথ্যাবাদী বলছে?

আমাকে মিথ্যাবাদী বলায় রসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, প্রত্যেক একশত বছরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসবেন বলে তিনি আমাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় (মায়াযাল্লাহ্)। দ্বিতীয়তঃ তিনি اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের ইমাম হবেন) বলেছিলেন, তা-ও ভুল প্রমাণিত হয়। আবার ক্রুশ-ধর্ম প্রবল হওয়ার সময় এক মসীহ্ ও মাহদী (আ.) আসবেন বলে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাও মিথ্যা হয়ে যায় (মায়াযাল্লাহ্)। কারণ ক্রুশ-ধর্ম প্রবল হয়েছে কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত ইমাম (নেতা) আসলেন না; যে মুসলমান হয়ে এটা স্বীকার করে, কার্যতঃ সে কি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না?

আমি আবার বলছি, আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। আমাকে মিথ্যাবাদী বলার পূর্বে নিজেকে কাফের (অস্বীকারকারী) হতে হবে। আমাকে বে-দীন (ধর্মহীন) ও গোমরাহ্ (পথভ্রষ্ট) বলতে যে সময় লাগবে, তার পূর্বে নিজের গোমরাহী ও বে-দীনি স্বীকার করতে হবে। আমাকে কুরআন ও হাদীস বর্জনকারী বলার পূর্বে নিজেকেই কুরআন ও হাদীস বর্জন করতে হবে। আমি কুরআন ও হাদীসের সত্যতা প্রকাশ করি; কুরআন ও হাদীস আমার সত্যতা প্রকাশ করে। আমি গোমরাহ্ নই, আমি মাহ্দী। আমি কাফের নই, আমি أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (প্রথম ও উৎকৃষ্ট মু'মিন)। খোদা তা'লা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি এখন যা কিছু বলছি তা নির্ভুল। খোদার অস্তিত্বে যার বিশ্বাস আছে, কুরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যে সত্য বলে জানে, তার জন্য এটাই যথেষ্ট প্রমাণ। আমার মুখে শুনে তার নীরব হওয়া কর্তব্য। কিন্তু যার দুঃসাহস অতি মাত্রায় বেশি তার কোনো ঔষধ নাই স্বয়ং খোদাই তাকে বুঝাবেন।

অতএব, আমার অনুরোধ এই যে, খোদার উদ্দেশ্যে আপনি এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন এবং স্বীয় বন্ধুদেরকে পরামর্শ দিন তারা যেন আমার সম্বন্ধে ব্যস্ততা না দেখায়। সরল মনে এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে দেখে এবং বুঝার জন্য নামাযের মধ্যে খোদা তা'লার নিকট দোয়া করতে থাকে। **আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, জিদ ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে সত্য নির্ণয়ের জন্য কোনো লোক যদি খোদার নিকট দোয়া করতে থাকে, চল্লিশ দিনের মধ্যেই তার কাছে সত্য ব্যক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু এই শর্ত পালন করে খোদা তা'লার কাছে মীমাংসা চাওয়ার মতো লোক অতি অল্পই দেখা যায়।** অধিকাংশ লোকই স্বীয় বুদ্ধির দোষে অথবা জিদ ও কুসংস্কারের জন্য খোদার ওলীকে (বন্ধু) অগ্রাহ্য করে

নিজেদের ঈমান হারায়। ওলী নবীর সত্যতার নিদর্শন। ওলীর প্রতি বিশ্বাস না থাকলে নবীর প্রতিও বিশ্বাস থাকে না। নবীর প্রতি বিশ্বাস না থাকলে পরিণামে খোদার অস্তিত্বেও বিশ্বাস থাকে না। এরূপে ওলীকে অবিশ্বাস করার ফলে ঈমান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়।

প্রচারকার্যের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করে কুরআন শরীফের আয়াত مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ *(সূরা আল আম্বিয়া: ৯৭)* 'তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার ওপর থেকে ছুটে আসবে'-এর প্রতীকরূপে যারা লক্ষ লক্ষ লোকের ঈমান নষ্ট করছে, সেই খ্রিষ্টীয় উপদ্রব কি এখন বিদ্যমান নাই? এ প্রশ্ন এখন ভেবে দেখা অতি আবশ্যক। যে সংস্কারকের দ্বারা এ উপদ্রব রহিত হবে, হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁকে কি উপাধি দিয়েছেন? এ প্রশ্নেরও এখন উত্তর দেয়ার সময় এসেছে। দিন দিন ক্রুশ-ধর্মের জোর বাড়ছে। সর্বত্র তার আড্ডা জমছে। বহু মিশন স্থাপিত হচ্ছে এবং সুদূর দেশসমূহে তা বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। আর কোনো প্রমাণ না থাকলেও স্বতঃই আমাদেরকে স্বীকার করতে হয় যে, এ আগুন নিভানোর জন্য এ যুগে একজন সংস্কারকের আবির্ভাব আবশ্যক। খোদা তা'লাকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি আমাদেরকে আমাদের কথা অনুভব করার মধ্যেই এ প্রমাণটিকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, স্বীয় রসূলের মহিমা ও গৌরব প্রকাশের জন্য পূর্ব থেকে তিনি এ যুগের জন্য বহু ভবিষ্যদ্‌বাণী নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এ সকল ভবিষ্যদ্‌বাণী থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এযুগে একজন সংস্কারক আসবেন এবং يَكْسِرُ الصَّلِيبَ অর্থাৎ ক্রুশ-ধ্বংস করা হবে তাঁর একটি কাজ।

ক্রুশ-ধ্বংস বলতে কী বুঝতে হবে?

এভাবে চিন্তা করলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই এ কথা মেনে নিতে হবে যে, এ যুগে একজন সংস্কারকের আবশ্যক। ক্রুশ-ধ্বংস করা যে তাঁর এ সময়ের কাজ তা-ও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে যে বলা হয়েছে, 'তিনি ক্রুশ-ধ্বংস করবেন' এর অর্থ কী, তাই মীমাংসার বিষয়। তিনি কি ক্রুশের কাঠ ধ্বংস করে বেড়াবেন? এতে কী ফল হবে? একথা অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি যদি কাঠের তৈরি ক্রুশগুলি ধ্বংস করে বেড়ান তবে তা কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হবে না, এতে তেমন কোনো উপকার দর্শিবে না। কাঠের তৈরি ক্রুশগুলি যদি তিনি ধ্বংস করেন এর স্থলে সোনা, রূপা ও অন্যান্য ধাতুর ক্রুশ তৈরি হবে' এতে খ্রিষ্টধর্মের কতটুকু ক্ষতি হবে? হযরত আবু

বকর (রা.), এজিদ এবং সুলতান সালাহউদ্দিন অনেক ক্রুশ নষ্ট করেছিলেন। এ কাজের জন্য তাঁরা কি মসীহ্ মাওউদ বলে গণ্য হয়েছেন? নিশ্চয় নয়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ক্রুশ-ধ্বংস বলতে সেই কাঠের ক্রুশ বুঝায় না, যা অনেক খ্রিষ্টান গলায় ঝুলিয়ে রাখে। এর একটি গূঢ় অর্থ আছে। আর একটি হাদীসে يَضَعُ الْحَرْبَ অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন বলে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে তা এ গুঢ় অর্থের সমর্থন করে। এখন কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিক, একদিকে এ হাদীস অনুসারে মসীহ্ মাওউদ (আ.) যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দিবেন এবং তখনকার মতো জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হারাম বলে পরিগণিত হবে। আর এক দিকে তিনি ক্রুশ-ধ্বংস করবেন, অথচ তখন শান্তি বিরাজ করবে ও গভর্নমেন্ট ন্যায়বান হবে বলে আর একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে। ক্রুশ-ধ্বংস করা যেহেতু মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজ এবং যুদ্ধও যখন হবে না, তখন আপনি নিজেই বিবেচনা করলে বুঝবেন, ক্রুশ-ধ্বংস করার অর্থ কাঠের বা পিতলের যে ক্রুশ খ্রিষ্টানরা গলায় ঝুলিয়ে রাখে, তা ধ্বংস করা নয়, বরং ক্রুশ-ধ্বংসের অর্থ হবে খ্রিষ্টধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করা। আমি যে দাবি করেছি, তার সত্যতা কি এতে প্রমাণিত হয় না? বস্তুত يَكْسِرُ الصَّلِيبَ ক্রুশ-ধ্বংস যে সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে, তা নিয়েই আমি এসেছি।

ধর্মের নামে যুদ্ধ করা হারাম

আমি পরিষ্কার ঘোষণা করেছি, বর্তমান সময়ে জিহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধ হারাম (নিষিদ্ধ)। কারণ 'ইয়াকসিরুস্ সালীব' (ক্রুশ-ধ্বংস করা) যেমন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজ, তদ্রুপ 'ইয়াযাউল হার্‌ব' (যুদ্ধ রহিত করা) তাঁর আরেকটি কাজ; এ শেষোক্ত কাজের জন্য জিহাদ হারাম বলে ফতওয়া দেয়া আমার কাজ ছিল। অতএব আমি বলেছি, বর্তমান যুগে ধর্মের নামে অস্ত্র ধারণ করা হারাম এবং ভীষণ পাপ। সীমান্ত প্রদেশের অসভ্য লোকেরা জিহাদের নামে ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে। এভাবে শান্তি নষ্ট করে তারা ইসলামের দুর্নাম রটাচ্ছে। তাদের জন্য আমার বড়োই দুঃখ হয়। এ বর্বরদের জন্য কোনো প্রকৃত মুসলমানেরই সহানুভূতি থাকা উচিত নয়।

তবে 'ক্রুশ-ধ্বংস' করার অর্থ কী?

মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা কর্তব্য যে, খ্রিষ্টধর্ম যখন প্রবল হবে তখন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আসার সময় এবং ক্রুশ-ধ্বংস করা তার কাজ। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য

খ্রিষ্টধর্মের পূর্ণ খণ্ডন করা। তিনি দলিল-প্রমাণ দিয়ে খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তিহীনতা স্বপ্রমাণ করবেন। আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্যে এবং অলৌকিক ঘটনার বলে তাঁর দেয়া দলিল-প্রমাণ প্রবল শক্তিশালী হবে এবং ঐ ধর্মের অসারতা জগদ্‌বাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। লক্ষ লক্ষ লোক একথা স্বীকার করবে যে, খ্রিষ্টধর্ম মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। এ কারণে আমার পূর্ণ চেষ্টা ক্রুশ-ধর্মের বিরুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু

ক্রুশ-ধ্বংস করার আর কি কিছু বাকি আছে? হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথাই ঐ ধর্মকে নির্মূল করে দিয়েছে। এ কথা যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নি, কাশ্মীরে আসার পর স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন ক্রুশ ধ্বংসের আর কী অবশিষ্ট আছে, তা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাকে বলে দিবেন কি? জিদ, কুসংস্কার যার হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নি এবং বিচারশক্তি নষ্ট করে নি, এরূপ খ্রিষ্টানও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এ প্রশ্নের ফলে খ্রিষ্টধর্ম সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।

ফলকথা, খ্রিষ্টধর্ম যখন প্রবল হয়ে উঠবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠাবেন। এ কথা অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ক্রুশ-ধর্মের উপদ্রব যখন খুব বেশি হবে, যখন তার প্রচারকল্পে যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করা হবে, শিরক ও মৃতের পূজা-রূপ অনাচারে পৃথিবী যখন পরিপূর্ণ হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা যে মহাপুরুষকে পাঠাবেন তাঁর কাজ হবে মৃতের পূজা ও ক্রুশ-পূজার অভিসম্পাত দূর করে যাবতীয় অনাচার থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করা। এটাই ক্রুশ-ধ্বংসের স্বরূপ। বাহ্য দৃষ্টিতে 'ইয়াকসিরুস সালীব' (ক্রুশ-ধ্বংস করা) ও 'ইয়াযাউল হার্‌ব' (যুদ্ধ রহিত করা) পরস্পর বিরোধী মনে হয়। কারণ বিনা যুদ্ধে ক্রুশ-ধ্বংস করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য যারা বুঝে নি, তদ্রূপ অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের কাছে এটা বিপরীতার্থক বোধ হবে। বস্তুতপক্ষে 'ইয়াযাউল হার্‌ব' বা 'যুদ্ধ রহিত করা' ক্রুশ ধ্বংসের প্রকৃত অর্থই প্রকাশ করছে। আমি ইতিপূর্বেই বলেছি, ক্রুশ-ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ কাঠের বা অন্য কোনো জিনিসের তৈরি ক্রুশ ভেঙে ফেলা নয়। ক্রুশীয় ধর্মকে পরাভূত করাই ক্রুশ ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ। ধর্মের পরাজয় দলিল-প্রমাণের দ্বারাই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ

'সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়, যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে।' *(সূরা আল আনফাল: ৪৩)*

যাহোক, আমার বিরোধী আলেমরা যদি এতদূর বাড়াবাড়ি না করে, খোদার সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে স্মরণ রেখে শান্তমনে এ সমূদয় বিষয় চিন্তা করে দেখত, তাহলে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত নিশ্চয় তাদের আর কোনো পথ থাকত না। তারা দেখতে পেত যে, আমি এ (হিজরী চতুর্দশ'–প্রকাশক) শতাব্দীর শিরোভাগে এসেছি। বরং আরো ঊনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ৩০ বছর চলছে– প্রকাশক) বছর অতীত হয়েছে। শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদের আগমন আবশ্যক, অন্যথায় নিশ্চয় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। আবার তারা যদি খ্রিষ্টধর্মের উপদ্রব লক্ষ্য করত, তাহলে দেখতে পেত যে, ইসলামের জন্য এটা অপেক্ষা বড়ো বিপদ আর কখনো আসে নি, বরং যখন থেকে নবীদের আবির্ভাব আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত এত বড়ো বিপদ আর কখনো দেখা দেয় নি। দর্শনের দিক দিয়ে ধর্মের ওপর আক্রমণ এসেছে। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ধর্মের ওপর আক্রমণ চলছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যার যে বিষয় জানা আছে, তার মাধ্যমে ইসলামকে আক্রমণ করছে। নর-নারী উভয়ে বক্তৃতা করছে এবং বিবিধ উপায়ে ইসলামের প্রতি লোকদেরকে বীতশ্রদ্ধ করতে চেষ্টা করছে। খ্রিষ্টধর্মের প্রতি লোকদেরকে আকৃষ্ট করা তাদের কাজ। হাসপাতালে যাও, দেখবে ঔষধের সাথে খ্রিষ্টধর্মের কথা শুনাচ্ছে এমনও অনেক সময় ঘটেছে যে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়ে স্ত্রীলোক বা বালক-বালিকা নিরুদ্দেশ হয়েছে এবং পরে খ্রিষ্টান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তারা সাধু বেশে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। ফল কথা, কুপ্ররোচণার এমন কোনো পন্থা বাকি নেই, যা এ খ্রিষ্টান জাতি অবলম্বন করে নি। তাদের উপদ্রবের উপর যদি আলেমদের দৃষ্টি থাকত, তাহলে নিশ্চয় তারা স্বীকার করত যে, এর প্রতিকারের জন্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নিশ্চয় কারো আগমন আবশ্যক। কুরআন করীমের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগ যদি তারা লক্ষ্য করত, তাহলেও তারা নিশ্চয় বলত যে, وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ (আমরাই এর রক্ষক) বলে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, তদনুযায়ী নিশ্চয় কুরআন শরীফের একজন রক্ষকের আবির্ভাব আবশ্যক। তারা যদি হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফা ও মুহাম্মদী খলীফার সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তাহলেও তাদেরকে মানতে হতো যে, এ চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন 'খাতামুল-খুলাফার' আবির্ভাব

আবশ্যক। এমন একটি দু'টি নয়, বহু কথা আছে, যা তাদের হেদায়াতের উপকরণ হতে পারত। কিন্তু তারা ইন্দ্রিয়ের পূজা এবং জিদ ও কুসংস্কারবশত এসব কথা না ভেবেই শত্রুতা করছে।

আমি যে–সব কথা উপস্থাপন করছি, তা সে ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে, যে কখনো ঘরের বাইরে যায় না এবং হুজরার (কুঠুরী) মধ্যেই যার জীবন কাটে। যে বলে, কোনো বিপদ উপস্থিত হয় নি, তাকে আমি শুধু কুসংস্কারে নিমজ্জমানই বলি না, বরং বেয়াদব ও দুষ্ট বলি। মহানবী (সা.)-এর সম্মানের খেয়াল তার অন্তরে নেই এবং কীভাবে তাঁকে সম্মান দেখানো আবশ্যক, তা সে আদৌ জানে না। বুদ্ধিমান ও ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা জানেন যে, মহানবী (সা.) এ বিপদকে কখনো সামান্য মনে করেন নি। বস্তুত এ বিপদ সামান্য নয়। আমি লোকদেরকে এ বিপদের কথা জানিয়ে দিতে চাই বলে বার বার একথা বলি। খ্রিষ্টানদের কাগজগুলি দেখে জানা যাবে যে, সেগুলির এক একটিরই লক্ষ লক্ষ কপি বের হয়। প্রচারের যে–সব উপায় এখন আছে, তা পূর্বে কখনো ছিল কি? এর পূর্বে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি পত্রিকা দেখাতে পার কি? এ শতাব্দীতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে–সব সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে তা একত্র করলে পর্বত সমান হয়ে বহু মাইল বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি না করে আমি বলছি যে, এসবের উচ্চতা জগতের উচ্চতম পর্বত থেকেও বেশি হবে এবং এ সমুদয় যদি বিস্তৃত করে জমির উপর সাজিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বহু মাইল ব্যাপী এলাকাকে ঢেকে ফেলবে। ইসলাম এখন কারবালার মাঠের শহীদের ন্যায় চারিদিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। অধিকন্তু আরো দুঃখ এ যে, আমার বিরুদ্ধবাদীরা বলে, 'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কারো আসার আবশ্যকতা নেই'।

অনর্থক বাক-বিতণ্ডাকারীর সাথে আমার কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। এমন লোকের সাথে কথা বলা, বৃথা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধান করে, সে আমার কাছে এসে অবস্থান করুক। তাকে বুঝিয়ে তার চিত্তে শান্তি আনয়ন করার জন্য আমি সর্বতোভাবে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দুঃখ এই যে, এরকম লোক পাওয়া যায় না। আমার বিরুদ্ধবাদী দু' চার দশ মিনিটেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে চায়। এটা যেন ধর্মের জুয়া খেলা। সত্য এভাবে বুঝা যায় না। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, ইসলামকে পরাভূত করার জন্য খ্রিষ্টানরা এখন কত জোর দিচ্ছে। কলকাতার বিশপ সাহেব লন্ডনে গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন যে, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করে কোনো লোকই ইংরেজ

গভর্নমেন্টের হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। এসব বক্তৃতা থেকে কি এ কথা অনুমান করা যায় না যে, লোকদেরকে খ্রিষ্টান করার জন্য কতটা চেষ্টা চলছে এবং খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্য কত স্পষ্ট। তাদের ইচ্ছা এই যেন একজন লোকও মুসলমান না থাকে। খ্রিষ্টান পাদরীরাও একথা স্বীকার করেছে যে, তাদের সামনে ইসলাম অপেক্ষা বড়ো বাধা আর নেই। স্মরণ রেখো, খোদা তা'লা তাঁর ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত। তিনি সত্যই বলেছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ⑩

'নিশ্চয় আমরা এই যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী।' *(সূরা আল হিজর: ১০)*

এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আসবেন বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তদনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ করেছেন। হাদীসে আমার নাম 'কাসিরুস্ সালীব' (ক্রুশ ধ্বংসকারী) রাখা হয়েছে। আমার এ দাবি যদি মিথ্যা হয়, নবুয়্যতের যাবতীয় ব্যাপারই মিথ্যা হবে। এর চেয়ে আরো আশ্চর্যের বিষয় এ হবে যে, খোদা তা'লা মিথ্যার সহায়তাকারী বলে প্রমাণিত হবেন (মায়াযাল্লাহ)। কারণ আমি তাঁর সাহায্য পেয়ে থাকি এবং তাঁর সহায়তা আমার সঙ্গে আছে।

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের লক্ষণ

অমূলক সন্দেহবশত আপত্তি করে বলা হয় যে, মসীহ্ (আ.) আকাশ থেকে আসবেন। তাঁর হাতে এক অস্ত্র থাকবে, তার দ্বারা তিনি দাজ্জালকে বধ করবেন। খোদা তা'লার যাবতীয় শক্তি দাজ্জালের আয়ত্তে থাকবে। মসীহ্ (আ.) আকাশ থেকে বিনা সিঁড়িতে নেমে আসবেন। কিন্তু দামেস্কের মিনারে পৌঁছে বিনা সিঁড়িতে নামবেন না। দাজ্জাল মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করবে। এরূপ অনেক কথা তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নযুল (আবির্ভাব) সম্বন্ধে তৈরি করে রেখেছে। দাজ্জালের সম্বন্ধে আরো বলা হয় যে, সে অন্ধ হবে। এতে দাজ্জাল কি বলতে পারবে না যে, সে একক ও অদ্বিতীয় বলে এবং সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখে বলে তার চক্ষু মাত্র একটি? যে–কোনো বুদ্ধিমান লোক এ সকল কথা চিন্তা করলে স্বতঃই তার হাসি পাবে যে, তারা কি অদ্ভুত কথা বলে! আমি যা কিছু বলছি, তা একটিও কাল্পনিক নয়; প্রত্যেকটিই বাস্তব। আমার কথাগুলির স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ

আছে এবং খোদা তা'লার সহায়তাও আছে। আজ যারা বুঝছে না, তারা পরে বুঝবে। আল্লাহ্‌র জ্যোতি কেউ নিভাতে পারে না।

নযুল শব্দটির ভুল অর্থ করো না

স্মরণ রেখো, শব্দের অর্থ করতে লোকে বড়োই ভুল করে। শব্দ কখনো ধাতুগত মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনো আলংকারিকভাবে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, সর্বপ্রথম তাঁর সেই স্ত্রীর মৃত্যু হবে, যার হাত সবচেয়ে বেশি লম্বা। মহানবী (সা.)-এর সম্মুখেই তাঁর বিবিরা তাঁদের হাত মেপে দেখলেন; কিন্তু মহানবী (সা.) এমন করতে নিষেধ করলেন। ঘটনাক্রমে যখন বিবি যয়নব মহানবী (সা.)-এর পর সর্বপ্রথম জান্নাতবাসিনী হলেন, তখন বুঝা গেল যে, হাত লম্বা কথাটি মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এর অর্থ সর্বাপেক্ষা দানশীলা। আল্লাহ্‌র কালামেও এমন উদাহরণ আছে, সেখানে শব্দের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করলে কোনোই অর্থ হয় না। যথা-

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

'যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে সে পরজগতেও অন্ধ হবে' *(সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৩)*। আপনি উজিরাবাদের অধিবাসী। সেখানকার হাফেজ আবদুল মান্নান (এ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ছিল না– অনুবাদক) এ সিলসিলার একজন ঘোরতর শত্রু। এ আয়াতের অর্থ তাকে জিজ্ঞাসা করুন। নিশ্চয় তাকে বলতে হবে যে, এ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করলে হবে না, রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, এ পৃথিবীতে যাদের চোখ নেই, পরকালেও তাদের চোখ থাকবে না। এ আয়াতের অন্ধ অর্থে জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাব বুঝতে হবে।

শব্দের রূপক অর্থ থাকা যখন প্রমাণিত বিষয়, বিশেষত ভবিষ্যদ্‌বাণীতে যখন রূপক থাকার রীতি আছে, তখন মসীহ্‌র 'নযুল' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলির প্রকাশ্য অর্থ ব্যতীত আর কোনো অর্থে গ্রহণ না করা কি বুদ্ধিমানের কাজ বলে গণ্য হতে পারে? আমার বিরুদ্ধবাদীরা সর্বত্রই প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে এবং ভিত্তিহীন কল্পনার আশ্রয় নেয়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন-

اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ

'নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবিলায় কোনো কাজে আসে না।' *(সূরা ইউনুস: ৩৭)*

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

'কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপবিশেষ।' *(সূরা আল হুজুরাত: ১৩)*

অলীক খেয়ালের বশবর্তী হয়ে শব্দের যদি প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহলে দৃষ্টিশক্তিহীনদের মুক্তির আশা পরিত্যাগ করতে হবে। যে কথার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই, তার উপর কেন যে তারা এত জোর দেয় তা আমার বুদ্ধিতে আসে না। খোদা তা'লার ভাষা সম্বন্ধে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে তাদের যদি জ্ঞান থাকত, তাহলে ভবিষ্যদ্‌বাণীর ভাষায় কি পরিমাণ রূপকের ব্যবহার থাকে তা জানত। মহানবী (সা.) স্বপ্নে স্বীয় হস্তে সোনার বলয় দেখেছিলেন যা তিনি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন; তার অর্থ ছিল ভণ্ড নবী। তাঁকে গরু জবাই করা দেখানো হয়েছিল। এর অর্থ ছিল তাঁর সাহাবাদের হত্যা। এটা কোনো অজানা কথা নয়। স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্বন্ধে এটাই খোদা তা'লার সাধারণ নিয়ম। দেখ, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যে স্বপ্ন কুরআন শরীফে উল্লিখিত হয়েছে তাতে কি চন্দ্র, সূর্য ও তারকাই বুঝায়? অথবা মিশরাধিপতির স্বপ্নে গরু দেখার অর্থ কি সত্য সত্যই গরু ছিল না আর কিছু? এমন একটি দু'টি নয়, হাজার হাজার উদাহরণ পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা একথা ভুলে গিয়ে শব্দের প্রকাশ্য অর্থের উপর জোর দেয়। এ প্রকার বিষয়ে মতভেদের মূল কারণ দু'টি। যথা, রূপকের স্থলে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা এবং প্রকাশ্য অর্থের স্থলে রূপক অর্থ গ্রহণ করা। ভবিষ্যদ্‌বাণীর ভাষায় যদি রূপকের অস্তিত্ব স্বীকার করা না হয় তাহলে কোনো কোনো নবীর নবুয়্যত প্রমাণ করা অতি কঠিন হয়ে পড়বে। ইহুদীরা এই বিপদে পড়েছিল। হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে লিখিত ছিল যে, তাঁর আসার পূর্বে ইলিয়াস নবী আকাশ থেকে আসবেন। মালাকী নবীর কিতাবে এ ভবিষ্যদ্‌বাণী অতি পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে। এ ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী ইহুদী জাতি ইলিয়াস নবীর আশায় আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু ইলিয়াস নবীর অবতরণের পূর্বেই যখন হযরত ইসা (আ.) আসলেন, তখন ইহুদীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তাদের এই সমস্যা দাঁড়াল যে, ইলিয়াস নবী আকাশ থেকে নেমে আসার পূর্বে মসীহ্ আসতে পারেন না।

এখন ন্যায়বিচার আবশ্যক। এই মোকদ্দমা যদি কোনো জজের আদালতে পেশ করা হয়, ইহদীদেরকেই তিনি ডিক্রী দিবেন, কারণ পরিষ্কার লেখা আছে যে, মসীহ্ আসার পূর্বে ইলিয়াস (আ.) আকাশ থেকে আসবেন। হযরত ঈসা (আ.) হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে ইলিয়াস (আ.)-এর 'বুরূজ'-সমগুণ ও

সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট প্রতিপন্ন করে ইয়াহইয়া (আ.)-কে ইলিয়াস (আ.) বলে সাব্যস্ত করলেন। এরূপ বুরূজের উদাহরণ ইতিপূর্বে ইহুদীদের মধ্যে ছিল না। ইহুদীদের কিতাবগুলি সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কিছু না বলাই আমার রীতি। কিন্তু কুরআন শরীফে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে,

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'যদি না জানো তবে তাহলে আহলে যিকরকে (কিতাবধারীদেরকে) জিজ্ঞাসা কর।' *(সূরা আন নাহল: ৪৪)*

এতদ্ব্যতীত কুরআন শরীফের কোথাও এ ঘটনার বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই। অন্যদিকে ইহুদী ও খ্রিষ্টান জাতি উভয়েই এ ঘটনা স্বীকার করে। ঘটনাটি যদি সত্য না হতো, তাহলে খ্রিষ্টানদের এর প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিল।

বিশেষত ঘটনাটি সত্য বলে স্বীকার করায় খ্রিষ্টানদেরকে অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এটা যদি মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যেত, তাহলে তারা এসব সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারত। এ সত্ত্বেও তারা যখন ঘটনাটিকে সত্য বলে স্বীকার করে, তখন আমাদের পক্ষে অযথা একে মিথ্যা বলার কারণ কি?

সত্যকথা এই যে, মসীহ্ (আ.) আসার পূর্বে ইলিয়াস (আ.) আসবেন বলে একটি প্রামাণিক সংবাদ ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ কারণেই যখন হযরত ঈসা (আ.) আসলেন তখন তারা বিপদে পড়ল। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে ইলিয়াস (আ.)-এর কথা জিজ্ঞাসা করল। তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণী স্বীকার করলেন এবং ইলিয়াস (আ.)-এর গুণসম্পন্ন বলে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে ভবিষ্যদ্বাণীর কথিত নবী সাব্যস্ত করলেন। এ সংবাদ যদি সত্য না হতো তাহলে ইয়াহইয়া (আ.)-কে ইলিয়াস (আ.) বলে সাব্যস্ত করার পরিবর্তে তাঁর এ কথা বলাই উচিত ছিল যে, ইলিয়াস (আ.)-এর আসার ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুল, কোনো ইলিয়াস (আ.) আসবেন না। হযরত ঈসা (আ.) যদি এ সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস না করতেন, নিশ্চয় তিনি ইয়াহইয়া (আ.)-এর রূপে ইলিয়াস (আ.)-কে দেখাতেন না। এটা সামান্য কথা নয়। হযরত ঈসা (আ.)-এর পক্ষে ইহুদীদের আপত্তি স্বীকার করে উত্তর দেয়াই একথার অতি পরিষ্কার প্রমাণ যে, তাতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যাহোক, ইহুদীদের এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য ছিল এবং তা গ্রহণ করে হযরত

ঈসা (আ.) উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইয়াহইয়া (আ.)-ই সেই ইলিয়াস (আ.) যাঁর আসার কথা ছিল। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে এটা বিশ্বাস করুক'।

রূপক বর্ণনা যদি গ্রহণযোগ্য না হয় এবং তা যদি ঐশী সংবাদের একটা প্রধান অঙ্গ না হয়, তাহলে আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমদেরও ইহুদীদের ন্যায় হযরত ঈসা (আ.)-এর দেয়া ব্যাখ্যা অস্বীকার করা আবশ্যক। আমি ইতিপূর্বেই দেখেছি যে, ইলিয়াস নবীর আগমন সংক্রান্ত সংবাদটিকে মুসলমানরা মিথ্যা বলতে পারে না। কারণ কুরআন একে মিথ্যা বলে নি। একে মিথ্যা বলার সর্বপ্রথম অধিকার ছিল হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের। তাঁরাও তাকে মিথ্যা বলেন নি। সুতরাং আমার বিরুদ্ধবাদীদের মতে রূপক যখন গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রত্যেক ভবিষ্যদ্‌বাণীই যখন প্রকাশ্য শাব্দিক অর্থে পূর্ণ হওয়া দরকার, তখন ইহুদীদের ন্যায় তাদেরকেও বলতে হবে যে, হযরত মসীহ্ (আ.) এখনও আসেন নি। হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন অস্বীকার করলে, মহানবী (সা.)-কেও অস্বীকার করতে হয়। এভাবে ইসলাম তাদের হাত থেকে চলে যাবে। এ কারণে আমি বার বার এ কথার ওপর জোর দেই যে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলায় ইসলামকে মিথ্যা বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অনুমান করতে পারেন যে, কোনো নবীর দ্বিতীয়বার আগমনের ভবিষ্যদ্‌বাণী যেমন রূপকভাবে পূর্ণ হয়, হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয়বার আগমনের ভবিষ্যদ্‌বাণী সেভাবেই পূর্ণ হওয়ার কথা। হযরত ঈসা (আ.)-এর ফয়সালা হাইকোর্টের ফয়সালার মতো গণ্য হবে। যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে কথা বলবে, সে বিফলকাম হবে। স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এরই যদি আসার কথা থাকত, তিনি পরিষ্কারভাবে বলতেন 'আমিই নিজে আসব। ইহুদীদের আপত্তি এই যে, ইলিয়াস (আ.)-এর তুল্য ব্যক্তিই যদি আসার কথা ছিল, খোদা তা'লা কেন বললেন না যে, ইলিয়াস (আ.)-এর তুল্য ব্যক্তিই তো আসবেন? ফলকথা, খোদাকে ভয় করে এবং বিশুদ্ধ মনে হযরত ইলিয়াস (আ.) সংক্রান্ত ঘটনাটি চিন্তা করলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, কারো দ্বিতীয়বার আসার কথা থাকলে তার কি অর্থ হয় এবং তিনি কীভাবে আসেন। দুই ব্যক্তি বাদানুবাদ করছে। একজন দৃষ্টান্ত পেশ করছে, আরেকজন দৃষ্টান্ত দিতে পারে না। এখন বলো কার কথা মেনে নেবার উপযুক্ত? স্বীকার করতে হবে যে, যুক্তিতর্কের ওপর যে ব্যক্তি দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে, তার কথাই গ্রহণযোগ্য। ইলিয়াস (আ.) সম্বন্ধে স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) যে ফয়সালা করেছিলেন, আমি দৃষ্টান্ত হিসেবে তা পেশ করছি।

আমার বিরুদ্ধে আলেমরা যদি তাদের দাবি সত্য বলে মনে করে, তবে তাদের দু' চার ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত, যাদের আকাশ থেকে নেমে আসার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সত্যের সমর্থনের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করা নিশ্চয় আবশ্যক। এ 'মোকদ্দমার' মীমাংসার বিষয় এই যে, কারো দ্বিতীয়বার আসার ভবিষ্যদ্‌বাণী থাকলে স্বয়ং ঐ ব্যক্তির আগমন বুঝতে হবে অথবা তার তুল্য ব্যক্তির আবির্ভাব বুঝতে হবে। এ দাবি যদি সত্য হয় যে, স্বয়ং সেই ব্যক্তিই আসবেন, তাহলে হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়্যতে যে সকল দোষ বর্তায়, তা খণ্ডন করা কর্তব্য। প্রথম, এই দোষ বর্তায় যে, তাঁর মীমাংসা সুবিবেচনা সম্মত নয়। দ্বিতীয়, ইলিয়াস (আ.) যখন আকাশ থেকে আসেন নি, মসীহ্ (আ.) কীভাবে আসতে পারেন? এ অবস্থায় ইহুদীদের অনুকূলে মীমাংসা দিতে হবে। আমার বিরুদ্ধবাদীরা এ আপত্তি খণ্ডন করুক। তারা রূপককে কর্তব্যের মধ্যে আনতে চায় না বলে তাদের ওপর এ বিপদ আসে। সারকথা এই যে, হযরত ঈসা (আ.) যে মীমাংসা করে গিয়েছেন তা-ই সত্য। ইলিয়াস (আ.)-এর দ্বিতীয়বার আগমনের অর্থ এটাই ছিল যে, তার স্বভাব ও গুণবিশিষ্ট তাঁর তুল্য কোনো ব্যক্তি আসবেন। এর বিপরীত প্রমাণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পূর্বে ও পশ্চিমে বিচরণ করে এ কথার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করো যে, দ্বিতীয়বার যার আসার কথা থাকে, তিনিই কি স্বয়ং এসে থাকেন? এ বিশ্বাস যদি মনে স্থান দাও, তবে এর ফলে ইসলাম হাত ছাড়া হবে। এ কারণে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। আমার বিরোধী মুসলমানরা কি তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে চায়? এ ঘটনার মাধ্যমে আর একটি আপত্তি করা যেতে পারে। কথিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করতেন এবং এতদ্‌ব্যতীত তাঁর আরো বহু ঐশ্বরিক শক্তি ছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, তিনি ইলিয়াস নবীকে পুনরুজ্জীবিত করলেন না কেন? অথবা নিজ ক্ষমতায় তাঁকে আকাশ থেকে নামিয়ে আনলেন না কেন?

আমার সঙ্গে যে বিবাদ, তা নিষ্পত্তি করার পূর্বে বিরোধী মুসলমানদের কর্তব্য এই যে, তারা যেন প্রথম সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করে ফেলে যার সম্মুখীন হযরত ঈসা (আ.)-কে হতে হয়েছিল। কারণ তাঁর ঐ বিষয়ের মীমাংসা আমার স্বপক্ষে হয়েছে। আসল ব্যাপার এই যে, নবীদের মাধ্যমে তাঁদের অনুসারীরা ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অনেক কথা শুনে থাকে। সময়মতো প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ঐ সব কথা সম্বন্ধে কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যখন সময় আসে এবং ঐ সংবাদ পূর্ণ হয়, তখন বুঝা যায় যে, এ ভবিষ্যদ্‌বাণীতে যাঁর বিষয়

উল্লেখ থাকে বা যাঁর সম্বন্ধে ঐ বাণী প্রয়োগযোগ্য হয়, তাঁকে তা বুঝবার ক্ষমতা দেয়া হয়। ইহুদী শাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিতরা বহুকাল ধরে ইলিয়াস (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের সংবাদ পড়ে আসছিলেন এবং খুব আগ্রহের সাথে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষাও করছিলেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেন নি। এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের একটি লক্ষণ ছিল। এ কারণে তাঁকে এর জ্ঞান দেয়া হয়েছিল এবং তিনি এর প্রকৃত মীমাংসা করতে পেরেছিলেন।

এভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শোকে হযরত ইয়াকুব (আ.) চল্লিশ বছর কাঁদলেন। অবশেষে তিনি যখন তাঁর সংবাদ পেলেন তখন বললেন, আমি ইউসুফ (আ.)-এর ঘ্রাণ পাচ্ছি! এর পূর্বে কেঁদে তাঁর চোখ খারাপ হয়েছিল। এ সম্বন্ধে জনৈক কবির একটি সুন্দর উক্তি আছে-

پِکِیْ پُرْسِیْد اَزْ آنْ گُمْ کَرْدِهْ فَرْزَنْد
کِہْ اَیْ رَوْشَنْ گُہَرْ پِیْرِ خِرَدْمَنْد
زِ مِصْرَشْ بُوْیِ پِیْرَاهَنْ شَنِیْدِیْ
چِرَا دَرْ چَاهِ کَنْعَانَشْ نَہْ دِیْدِیْ

‘সেই হারানো পুত্রের পিতাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন প্রবীণ! আপনি মিশর দেশ থেকে পুত্রের জামার ঘ্রাণ পাচ্ছেন, অথচ সে যখন কেনানের কূপে পড়েছিল, তখন তাকে দেখতে পান নি কেন?

পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক

এ সকল কথা অনর্থক নয়। যখন থেকে নবীর আগমন আরম্ভ হয়েছে, তদবধি এ নিয়ম চলে আসছে। আগে তার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। এ পন্থায় পক্ক ও অপরিপক্কের মধ্যে প্রভেদ জানা যায় এবং মু’মিন (বিশ্বাসী) ও মুনাফেকের (কপট) পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝٣

‘লোকেরা কি এটা মনে করেছে যে, তাদেরকে কেবল এ কারণে অব্যাহতি দেয়া হবে যে, তারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা

হবে না?' *(সূরা আল আনকাবুত: ৩)।* এমন কখনো হয় না। জাগতিক ব্যাপারেও পরীক্ষার নিয়ম আছে। সংসারের ব্যাপারে যখন পরীক্ষার প্রয়োজনিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরীক্ষা হবে না কেন? বিনা পরীক্ষায় প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না। অবশ্য পরীক্ষার কথা শুনে এমন সন্দেহে পড়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তা'লার জানার জন্য পরীক্ষার আবশ্যক এবং বিনা পরীক্ষায় তিনি কিছুই জানতে পারেন না। এমন মনে করা শুধু ভুলই নয়, বরং এটা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কারণ এতে আল্লাহ্ তা'লার একটি শ্রেষ্ঠ গুণ তাঁর সর্বজ্ঞতা অস্বীকার করা হয়। পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে গুপ্ত সত্য প্রকাশ করা এবং পরীক্ষিত ব্যক্তিকে তার ঈমানের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেয়া। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার সম্বন্ধ কতদূর দৃঢ়, তার বিশ্বস্ত ও ভক্তি কতখানি, পরীক্ষার ফলে সে তা জানতে পারে। এভাবে অন্য লোকেরাও তাঁর গুণের পরিচয় পায়। এ কারণে যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা গ্রহণ করায় তাঁর জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পায়, তবে তার কথার কোনো মূল্য নেই। প্রত্যেক অণু পরমাণুর সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান আছে কিন্তু কোনো লোকের ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের জন্য তার পরীক্ষা হওয়া একান্ত আবশ্যক। পরীক্ষারূপ যন্ত্রে পিষ্ট হওয়া ব্যতীত ঈমানের স্বরূপ প্রকাশ পেতে পারে না। কবি সত্যই বলেছেন-

ہَرْبَلَا کِیْں قَوْم رَا حَقْ دَادِہ اَسْت
زِیْرِ آں گَنْج کَرَمْ بِنِہَادِہ اَسْت

'আল্লাহ্ তা'লা এ জাতির জন্য যে–সব বিপদ নির্দিষ্ট করেছেন, তার প্রত্যেকটির নীচে অনুগ্রহের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে'– শেখ সাদী।

বিপদ আসা ও পরীক্ষা হওয়া চাই। এ ছাড়া সত্যের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। ইহুদী জাতির পক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের সময়কার পরীক্ষা খুব কঠিন হয়েছিল। যখনই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর কোনো আদিষ্ট পুরুষ আসেন, নিশ্চয় তিনি পরীক্ষা সঙ্গে নিয়ে আসেন। মূসা (আ.)-এর সদৃশ নবী আসবেন বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বাইবেলে ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে। কিন্তু আপত্তিকারীরা প্রশ্ন করে যে, নামধাম ইত্যাদি পূর্ণ পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা কেন বলে দেন নি যে, তিনি ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে, আবদুল্লার ঔরসে আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন? 'তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আসবেন' শুধু এতটুকু বলেছেন কেন? সত্যকথা

এই যে, যদি এতদূর খুলে বলা হতো, তবে ঈমান আর ঈমান থাকত না। দেখ, যে ব্যক্তি প্রথম রাত্রেই চাঁদ দেখে বলে দিতে পারে, তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলা যেতে পারে। কিন্তু যদি কেউ পূর্ণিমার চাঁদ দেখে দৃষ্টির দাবি করে, তা কি হাসির বিষয় হবে না? খোদা তা'লার নবী বা রসূলদেরকে চিনার সময় অবস্থা এমনই দাঁড়ায়। যাঁরা দৃঢ় সম্ভাবনা দেখেই চিনে নেন, তাঁরাই শ্রেষ্ঠতম মু'মিন (বিশ্বাসী) বলে পরিগণিত হন। তাঁদের মর্যাদা অনেক বেশি। কিন্তু যখন নবীদের সত্যতা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং স্রোতের ন্যায় তাদের দ্রুত উন্নতি হয়ে থাকে, তখন যারা তাঁকে মানে তারা সাধারণের মধ্যে গণ্য হয়।

খোদা তা'লার এ আইন যখন নবীদের সাথে আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, তখন আমি এর বাইরে থাকব কীভাবে? জনগণের মনে যদি সংকীর্ণতা ও জিদ না থাকে, তাহলে আমার কথা শুনা এবং আমার অনুসরণ করা তাদের কর্তব্য। তাদের দেখা উচিত, খোদা তা'লা কি তাদেরকে অন্ধকারে রাখেন অথবা আলোকের দিকে নিয়ে যান? আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে, যে ব্যক্তি ধৈর্য ও একাগ্রতার সাথে অনুসরণ করবে সে বিনষ্ট হবে না, সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। ঐসব লোক যারা আমাকে মেনেছে এবং এখন আমার সঙ্গে আছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে কোনো নিদর্শন দেখে নি? একটি দু'টি নয়, খোদা তা'লা অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়েছেন। কিন্তু নিদর্শনের ওপর ঈমানের ভিত্তি রাখলে আঘাত পাবার ভয় আছে। যার হৃদয় নির্মল ও অন্তরে খোদার ভয় আছে, তার কাছে আবার আমি দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আ.)-এর মীমাংসা পেশ করছি। ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ইহুদীরা যে প্রশ্ন করেছিল, তার উত্তরে হযরত ঈসা (আ.) যা বলেছিলেন তা সঠিক কি-না এ কথা আমাকে বলে দেয়া হোক। ইহুদীরা মালাকী নবীর গ্রন্থ দেখিয়ে বলেছিল যে, স্বয়ং ইলিয়াস নবীর আসার কথা আছে, তাঁর তুল্য ব্যক্তির কথা নেই। হযরত ঈসা (আ.) বলেন, 'ইয়াহইয়া (আ.)-ই আগমনকারী ইলিয়াস (আ.)। যদি মনে চায়, বিশ্বাস করো'। কোনো বিচারকের সামনে এ ব্যাপার রেখে মীমাংসা চাও এবং দেখ, ডিক্রী কোন পক্ষ পায়। বিচারক নিশ্চয় ইহুদীদের অনুকূলে মীমাংসা দিবেন। কিন্তু যার অন্তরে খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস আছে এবং যে খোদার প্রেরিত পুরুষরা কীভাবে আসেন তা জানে, সে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে যে, হযরত ঈসা (আ.) যা বলেছেন তা-ই নির্ভুল সত্য।

এখানে ব্যাপারটা কি এ রকমেরই নাকি অন্য কোনো প্রকারের? খোদার ভয় যার আছে, আমার এ দাবি মিথ্যা বলতে তার প্রাণ কেঁপে উঠবে। দুঃখের বিষয়, এ সকল লোকের ঈমান ফেরাউন বংশের সেই লোকটির ঈমানের তুল্যও নয়, যে বলেছিল, এ দাবিকারী যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে নিজে নিজেই ধ্বংস হবে। আমার সম্বন্ধে যদি তাকওয়ার (খোদাভীতি) সাথে কাজ করা হতো, তাহলে তারা এ কথাই বলত এবং লক্ষ্য করত যে, খোদা তা'লা আমাকে সাহায্য করেন কিংবা আমার জামা'ত ধ্বংস করেন।

কুরআন ও হাদীসের সত্যতা

আমার সাথে শত্রুতা করে তারা কুরআন শরীফকেও ছেড়ে দিয়েছে। আমি কুরআন শরীফ পেশ করি। এর বিপক্ষে তারা হাদীস পেশ করে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কুরআন শরীফের যে মর্যাদা আছে হাদীসের তা থাকতে পারে না। হাদীসকে আমরা খোদার কালামের সমান মর্যাদা দিতে পারি না। হাদীস তৃতীয় স্তরের বিষয়। এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, কোনো একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত করার পক্ষে হাদীস সহায়তা করে। কিন্তু সত্যের বিপক্ষে অনুমানের কোনো মূল্য নাই।

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

'নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবিলায় কোনো কাজে আসে না' *(সূরা ইউনুস: ৩৭)*। বস্তুত এ সম্বন্ধে তিনটি বিষয় আছে– প্রথম কুরআন, দ্বিতীয় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুষ্ঠিত কাজ বা সুন্নত এবং তৃতীয় হাদীস। কুরআন খোদা তা'লার পবিত্র বাণী; রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি এটা নাযিল হয়েছিল। কুরআনের আদেশ কার্যে পরিণত করার জন্য মহানবী (সা.) যা কিছু করতেন তাই সুন্নত। কুরআন ও সুন্নত লোকদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়া মহানবী (সা.)-এর কাজ ছিল। এ কারণেই হাদীসমূহ পুস্তকাকারে সংকলিত হওয়ার পূর্বেও ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলা সম্ভবপর ছিল। এখন একটা ধোকার বিষয় এ যে, তারা হাদীস ও সুন্নতকে মিলিয়ে ফেলে। বস্তুত এ দু'টি এক বিষয় নয়। অতএব কুরআন ও সুন্নত অনুযায়ী পরীক্ষা না করে আমরা হাদীসকে কোনো স্থান দিতে পারি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এই যে, হাদীস পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী কোনো হাদীস যতই দুর্বল বা বিকৃত বলে প্রমাণিত হোক না কেন এবং ঐ হাদীসকে যতই নিম্নশ্রেণির বলা হোক না কেন, কুরআন ও সুন্নতের বিপরীত না হলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। আমার বিরুদ্ধবাদীরা এ ব্যবস্থা স্বীকার করে না, তাদের মতে

কোনো হাদীস যদি হাদীস পরীক্ষার নিয়মানুসারে সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তা কুরআন শরীফের যতই বিরোধী হোক না কেন, তা মেনে নেয়া চাই।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিচার করুন। খোদার ভয় রেখে এ বিষয়ে বিচার করে দেখুন, সত্য কোন দিকে? তারা ঠিক বলে, নাকি আমার কথা ঠিক? আমি খোদার বাণী এবং তাঁর পবিত্র রসূল (সা.)-এর সুন্নতকে (ব্যবহারিক জীবন) শ্রেষ্ঠ জানি। তারা লোকের নির্ধারিত নিয়মকে শ্রেষ্ঠ জানে, অথচ নিয়ম প্রণেতাদের মধ্যে কেউই এ দাবি করে নি যে, খোদার বাণী পেয়ে তিনি হাদীস পরীক্ষার ঐ নিয়মগুলি উদ্ভাবন করেছেন। ব্যাপার যদি এটাই হয় যে, কুরআন ও সুন্নত ব্যতীত হাদীস পরীক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত আর কোনো মাপকাঠি আছে, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, শিয়া ও সুন্নী উভয়ের হাদীসগুলিকে সঠিক বলে স্বীকার করা হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেউ দেয় না।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে মীমাংসা করোবেন?

মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব তাঁর 'এশায়াতে সুন্নাহ' নামক পত্রিকায় স্বীকার করেছেন যে, 'আহলে কাশফ' অর্থাৎ আত্মিক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মুহাদ্দিসদের পরিকল্পিত নিয়মের অধীনে নন। এসব নিয়মের দুর্বল হাদীসকে তারা বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত হাদীসকে দুর্বল বলতে পারেন। কারণ, তাঁরা সাক্ষাৎভাবে খোদা ও রসূলের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে থাকেন। এমন যখন অবস্থা, তখন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কি এ প্রণালীতে হাদীসের সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের অধিকার থাকবে না? তিনি 'হাকাম' অর্থাৎ মীমাংসাকারী হয়ে আসবেন। তিনি কি খোদা তা'লার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করবেন না? রসূলে করীম (সা.)-এর আত্মিক প্রভাব থেকে কি তিনি জ্ঞানলাভ করবেন না? রসূলে করীম (সা.)-এর আত্মিক প্রভাব থেকে কি তিনি বঞ্চিত থাকবেন? এ বিষয়ে যদি তাঁর অধিকার না থাকে তবে বলে দাও তিনি কোন ধরনের 'মীমাংসাকারী' হবেন এবং তাঁর মীমাংসার কি মূল্য হবে? অতএব, তারা যখন হাদীসকে সুন্নতের সাথে মিলিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে, তখন তারা যেন এ কথা স্মরণ রাখে যে, কুরআন ও সুন্নত থেকে হাদীস স্বতন্ত্র বিষয়।

আমাদের জিলার হাফেয হেদায়াত আলী নামক একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাঁর সাথে প্রায়ই আমার দেখা করার সুযোগ হতো। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর আগমন সংক্রান্ত কিতাবগুলিতে হাজার

হাজার লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এর সবগুলো পূর্ণ হয় নি, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এখন বিষম বিবাদ উপস্থিত হবে। এ সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা অপেক্ষা করতে থাকবে। অথচ সকল লক্ষণ একই সময়ে পূর্ণ হয় না।' বস্তুত তাঁর অনুমান সত্য হয়েছে। এখন তা-ই ঘটেছে। সত্য সত্যই লোকেরা মানে নি।

আমি বার বার বলেছি এবং এটাই সত্যকথা যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীতে রূপকের ব্যবহার খুব বেশি থাকে এবং একাংশ প্রকাশ্য অর্থেও পূর্ণ হয়। এ নিয়মই আদিকাল থেকে চলে আসছে। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, আমি এটা অস্বীকার করতে পারি না। সমস্ত হাদীসই যদি পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, শিয়াদের হাদীস, সুন্নীদের হাদীস আর এভাবে সকল সম্প্রদায়ের সব হাদীসই যদি পূর্ণ হতে হয়, তাহলে নিশ্চয় স্মরণ রেখো যে, মসীহ্ (আ.) অথবা মাহদী (আ.) কেউই কখনো আসবেন না। বিবেচনা করো, আমার চেয়ে রসূলে করীম (সা.)-এর আবশ্যকতা অনেক বেশি ছিল। তিনি যখন আসলেন, সকলেই কি তাঁকে মেনে নিয়েছিল? তওরাত বা ইনজীল গ্রন্থে তাঁর আগমনের যে–সব লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তার সবগুলি কি পূর্ণ হয়েছিল? খোদার উদ্দেশ্যে একবার চিন্তা করে দেখ এবং উত্তর দাও। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে এ বিষয়ে যে–সব গল্প প্রচলিত ছিল এবং তাদের গ্রন্থে যে সব লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তৎসমুদয়ই যদি পূর্ণ হয়ে থাকত, তবে কী কারণে তারা তাঁকে মেনে নেয় নি?

জেনে রাখ, সমুদয় লক্ষণ কখনো পূর্ণ হয় না। কারণ কতক লক্ষণ লোকদের কল্পিত, আর কতকগুলি কল্পিত না হলেও তার ভুল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। নবী মাত্রকেই অস্বীকার করা হয়েছে এবং অজুহাত দেখানো হয়েছে যে, সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ হয় নি। এখনও মানুষ এ চিরপ্রচলিত প্রথার অনুসরণ করছে। কারো অস্বীকার রোধ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। তবে আমি এ কথা বলছি, তারা আমার কথা শুনার পর উত্তর দিক। অনর্থক কথা সৃষ্টি করা ধর্মপরায়ণতার বিরোধী। নবীদের সত্য-মিথ্যা বুঝার যে নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এ সিলসিলার পরীক্ষা করো। তারপর দেখ সত্য কোন দিকে। কল্পিত ধারণা বা কল্পিত নিয়ম-কানুনে কোনো ফল হয় না। এমন পন্থা দ্বারা আমি আমার সত্যতা প্রমাণ দেই না। নবীদেরকে পরীক্ষা করার যে নিয়ম আছে, আমি তদনুযায়ী আমার দাবি পরীক্ষা করতে বলি। এ নিয়মানুযায়ী এটা পরীক্ষা করা হয় না কেন? যে ব্যক্তি অন্তর খুলে আমার কথা শুনবে, সে আমাকে মেনে নিবে এবং তার কল্যাণ

হবে। কিন্তু যার অন্তরে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ আছে, তার পক্ষে আমার কথায় উপকার পাওয়া সম্ভব নয়। 'আহওয়াল'-এর (দ্বৈত দৃষ্টিগ্রস্ত রোগীর) সাথে তাদের তুলনা হতে পারে। 'আহওয়াল' ব্যক্তি এক-কে দুই দেখে। যতই প্রমাণ দাও না কেন, এটা দুই নয় এক, কিন্তু সে দুই-ই বলবে। কথিত আছে যে, একজন আহওয়াল (টেরা) কারো কাছে চাকুরী করত। মনিব তাকে বললেন, 'ঘরের ভিতর থেকে আয়না নিয়ে আস'। সে ঘরের ভিতর থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আয়না তো দুইটি আছে, কোনটি আনব?' মনিব বললেন, 'একটি আছে, দুইটি নয়'। আহওয়াল বলল, 'আমি কি মিথ্যা কথা বলছি?' মনিব বললেন, 'একটি ভেঙে ফেল'। আয়নাটি ভেঙে ফেলার পর আহওয়াল (টেরা) বুঝল যে তার ভুল হয়েছে; বস্তুত আয়না একটিই ছিল। কিন্তু আমার সামনে যে সকল 'আহওয়াল' আছে তাদেরকে আমি কি উত্তর দিব? তারা যদি কোনো কথা বার বার উপস্থিত করে, তবে তা ঐ সকল হাদীসই হবে। অথচ তারা নিজেরাই হাদীসকে অনুমানমূলক বৈ আর কোনো উচ্চস্থান দেয় নি। তারা জানে না যে, এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের এসব রুক্ষ ও অপরিপক্ক কথার জন্য লোকে হাসবে। যারা সত্য বুঝতে চায়, তাদের প্রত্যেকেরই আমার দাবির প্রমাণ চাওয়ার অধিকার আছে। তাদের জন্য আমি ঐসব কথাই পেশ করে থাকি যা নবীগণ পেশ করতেন।

আমি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নিয়মগুলি পেশ করি; বর্তমান যুগে যে একজন সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে তা দেখিয়ে দেই। আমার হাতে যে সকল অলৌকিক নিদর্শনের এক তালিকা প্রস্তুত করেছি তাতে প্রায় দেড়শ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এক হিসাবে এ সব ঘটনার কোটি কোটি সাক্ষী আছে। অমূলক কথা পেশ করা ভালো লোকের কাজ নয়। মহানবী (সা.) এ কারণেই বলেছিলেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'হাকাম' (মীমাংসাকারী) হয়ে আসবেন। তাঁর মীমাংসা গ্রহণ করো। যাদের মনে কুবুদ্ধি আছে এবং মানার ইচ্ছা নেই, অনর্থক বাকবিতণ্ডা করা ও দোষ দেখানো তাদের কাজ। কিন্তু তারা জেনে রাখুক যে, পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রচণ্ড আক্রমণসমূহ দ্বারা আমার সত্যতা প্রকাশ করবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি মিথ্যা দাবি করতাম, নিশ্চয় তিনি আমাকে ধ্বংস করতেন। কিন্তু আমার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ বস্তুত তাঁরই নিজস্ব কাজ। আমি তাঁরই পক্ষ থেকে এসেছি। আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় সেই খোদা-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং স্বয়ং তিনিই আমার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝার দরুণ যারা রূপকের বর্ণিত ব্যাপারে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে, তাদেরকে অবশেষে ভবিষ্যদ্‌বাণীই অস্বীকার করতে হয়। ইহুদীদেরকে এ বিপদে পড়তে হয়েছিল এবং খ্রিষ্টানদের এখন এ বিপদ ঘটছে। খ্রিষ্টীয় চার্চ বা পাদরীদের প্রভাব জগৎময় ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ খ্রিষ্টান এ প্রভাবকেই হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন মনে করে।

সমুদয় লক্ষণ কখনো জনসাধারণের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণ হয় না। এরূপ হলে নবীদের সময় মতভেদ হবে কেন? তাঁদেরকে গ্রহণ না করারইবা কারণ কী? ইহুদী জাতির কাছে জিজ্ঞাসা করো, মসীহ্ (Messiah) (আ.) আসার যাবতীয় নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে কি? তারা বলবে, পূর্ণ হয় নি। জেনে রাখ, এ বিষয়ে আমি যা বলছি, তাই খোদার কানুন। খোদার কানুনে কখনো কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

'এবং তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবে না' *(সূরা আল আহযাব: ৬৩)*। মানুষের ধারণা, মানুষের দেয়া ব্যাখ্যা বা মানুষের অনুমান সম্পুর্ণরূপে নির্ভুল ও নিশ্চিত সত্য বলে পরিগণিত হতে পারে না। এতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কোনো ব্যাপার সংঘটিত হবার পূর্বে যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা হয় তা নির্ভুল বলে গ্রহণ করা যায় না। যখন সময় আসে তখন যাবতীয় আবরণ উন্মোচিত হয়। এ কারণেই আগমনকারীকে 'হাকাম' বা মীমাংসাকারী আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ আখ্যা থেকে এটাও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তখন মতভেদ খুব বেশি থাকবে। অন্যথায় তাঁকে 'হাকাম' বলা হবে কেন? অতএব হাকামের মুখ থেকে যে কথা বের হয় তাই সত্য কথা।

নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ লিখেছেন যে, সেই 'হাকাম' কুরআনেই বেশি দৃষ্টি রাখবেন। কারণ হাদীসে মানুষের হাত লেগেছে। আর কুরআন খোদার অপরিবর্তনীয় বাণী; এতে মানুষের হাত লাগে নি। কুরআন শরীফ মহানবী (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল। এটা তাঁর একটি প্রধান ও চিরস্থায়ী অলৌকিক ক্রিয়া। খোদা তা'লার এ বাণীর বিরুদ্ধে মানুষের কথা পেশ করা হয়, এটা কি দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় নয়? খোদার অনুগ্রহে আপনাকে বুদ্ধিমান বলে বোধ হচ্ছে। আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি, হাদীসের মর্যাদা কি কুরআনের তুল্য হতে পারে? হাদীসের মর্যাদা যদি কুরআনের তুল্য হয়, তাহলে স্বীকার করতে

হবে যে, মহানবী (সা.) ভালোভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে যান নি। (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ কুরআন শরীফের মৌলিকতা রক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু হাদীসের জন্য তিনি অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা করে যান নি। নিজ তত্ত্বাবধানে তিনি হাদীস লেখাবার ব্যবস্থা করেন নি। মহানবী (সা.) তাঁর রসূল হওয়ার দায়িত্ব পূর্ণ করেন নি, কোনো মুসলমান কি এ কথা স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে? এটা মুসলমানদের কাজ হতে পারে না, এটা ধর্মহীন নাস্তিকেরই কাজ।

আবার চিন্তা করে দেখুন! মহানবী (সা.) কি নিজের তত্ত্বাবধানে হাদীস লিখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন নাকি কুরআন শরীফের? মহানবী (সা.) যে তাঁর পরবর্তীদের জন্য কুরআন রেখে গিয়েছেন, এ অতি পরিষ্কার কথা। কারণ তাঁর শিক্ষা কুরআনেই আছে। হ্যাঁ! এ কথা সত্য যে, কুরআনের সাথে তিনি তাঁর আদর্শ (সুন্নত) রেখে গেছেন। যথা– কিতাব ও সুন্নত। হাদীস এ দু'টির বাইরে, তৃতীয় জিনিস। ঐ দু'টি জিনিস হাদীসের ওপর নির্ভর করে না। অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে, কুরআন ও সুন্নতের বিরোধী না হলে নিম্নশ্রেণির যে হাদীসগুলিকে হাদীস-শাস্ত্রবিদ জাল বলে প্রমাণ করেন, তা-ও মান্য করা কর্তব্য। আমি এতদূর পর্যন্ত হাদীসের সম্মান করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাকে কুরআনের ওপর প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত নই। মহানবী (সা.) এ কথা বলেন নি যে, আমি তোমাদের জন্য হাদীস রেখে যাচ্ছি। বরং তিনি কথা বলেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য কুরআন রেখে যাচ্ছি। হযরত উমর (রা) বলতেন,

حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ

'খোদার কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট'

এখন আল্লাহ্‌র কিতাব খুলে দেখুন, তা কী মীমাংসা দেয়! এর প্রথম সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায সিদ্ধ হয় না। এ সূরা পড়ুন আর দেখুন তা কী শিক্ষা দেয়–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

'তুমি আমাদেরকে সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো, তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, কোপগ্রস্তদের পথে নয় এবং পথভ্রষ্টদের পথে নয়।' *(সূরা আল ফাতিহা: ৬-৭)*

এ দোয়াতে ‘মাগযুব ও যাল্লীনদের’ পথ থেকে বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ‘মাগযুব’ বলতে সকল তফসীরকারক ইহুদী বুঝিয়েছেন এবং যাল্লীন, অর্থে খ্রিষ্টানদেরকে বুঝিয়েছেন। এ উম্মতে যদি এ বিপদ আসার সম্ভাবনা না থাকত, তবে এ দোয়া শিক্ষা দেয়ার অর্থ কি? সবচেয়ে বড়ো বিপদ দাজ্জালের। অথচ ‘ওয়ালায্যাল্লীনের’ স্থলে ‘ওয়ালাদ্দাজ্জাল’ বলা হয় নি কেন? খোদা তা’লা কি এ বিপদের কথা জানতেন না? বস্তুত এ দোয়ার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে। এ উম্মতের ওপর এমন সময় আসার কথা ছিল যখন ইহুদীদের যাবতীয় দোষ তাঁদের মধ্যে আসবে। ইহুদী সে জাতি যারা হযরত ঈসা (আ.)-কে গ্রহণ করে নি। এখানে ইহুদীদের পথ থেকে বাঁচার প্রার্থনা করা হয়েছে। এ প্রার্থনার উদ্দেশ্য মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অগ্রাহ্য করে ইহুদী (সদৃশ) না হওয়া।

যাল্লীন অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের পথ থেকে বাঁচার জন্য যে প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে ক্রুশ-ধর্মের প্রভাব অতি বিপজ্জনক হবে। এটাই যাবতীয় অনর্থের নিদান বা জননী হবে। দাজ্জালের উপদ্রব তা থেকে স্বতন্ত্র আর কিছু হবে না। অন্যথায় নিশ্চয় তার পরিচয় উল্লেখ করা হতো।

সাতটি প্রমাণ

গির্জায় গিয়ে দেখুন এ বিপদ ভয়ংকর কি-না? কুরআন শরীফ পড়ুন আর চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ্ তা’লা কি এ বলে প্রতিজ্ঞা করেন নি যে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ⑩

অর্থাৎ ‘তিনিই কুরআনকে রক্ষা করবেন’। আবার তিনি আয়াতে ‘এস্তেখলাফে’ এক ‘খাতামুল-খুলাফা’ (শ্রেষ্ঠ খলীফা) পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এ সকল কথা একত্র করে ভেবে দেখুন।

(১) তওরাত কিতাবে (Old Testament-এ) যে ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে, তদনুযায়ী কুরআন শরীফেও মহানবী (সা.)-কে হযরত মূসা (আ.)-এর সদৃশ নবী বলে স্বীকার করা হয়েছে। এ উপমার সার্থকতার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর পর যেমন তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি ছিল, তেমনি মহানবী (সা.)-এর পরেও তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। এ খেলাফতের আর কোনো প্রমাণ না থাকলেও পরপর প্রতিনিধি নিশ্চয় থাকা চাই।

(২) আয়াত ‘এস্তেখলাফে’ আল্লাহ্ তা’লা স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং এ খেলাফত পূর্ববর্তী খেলাফতের তুল্য হবে। এ খেলাফতের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এবং উপরুল্লিখিত উপমার সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর শেষ খলীফা ছিলেন, মুহাম্মদী উম্মতেও তেমনি একজন শেষ খলীফা থাকা আবশ্যক।

(৩) রসূলে করীম (সা.) বলেন, اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ ‘তোমাদের (নেতা) তোমাদের মধ্য থেকে হবে’। অর্থাৎ মুহাম্মদী উম্মতের বাইরে কেউ নেতা হবে না।

(৪) তিনি এ কথাও বলেছেন যে, প্রত্যেক একশত বছরের মাথায় ধর্মে নবজীবন সঞ্চার করার জন্য মুজাদ্দিদ আসবেন। বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ থাকা আবশ্যক। প্রচলিত অনাচার দূর করাই মুজাদ্দিদের কাজ। খ্রিষ্টধর্মের উৎপাতই বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা বড়ো অনাচার। সুতরাং বর্তমান শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দিদ হবেন তাঁর يَكْسِرُ الصَّلِيبَ অর্থাৎ ক্রুশ ধ্বংসকারী হওয়া আবশ্যক। এটা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় উপাধি।

(৫) হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফাদের সাথে যে উপমা দেয়া হয়েছে, তদনুযায়ী মুহাম্মদী সিলসিলার শেষ খলীফার আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীতে হওয়া আবশ্যক। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন।

(৬) মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যে–সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে তার মধ্যে অনেকগুলি পূর্ণ হয়েছে। যথা– (ক) রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্যের গ্রহণ হওয়া, এটা দু’বার হয়ে গিয়েছে। [১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধে প্রকাশক]; (খ) হজ্জ স্থগিত থাকা, (গ) দুই শিং বিশিষ্ট তারকার উদয় হওয়া; (ঘ) প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া; (ঙ) রেলগাড়ীর প্রচলন হওয়া, উটের ব্যবহার উঠে যাওয়া ইত্যাদি।

(৭) সূরা ফাতিহার দোয়া থেকেও প্রমাণিত হয় যে, যাঁর আসার কথা আছে তিনি এ উম্মতের মধ্য থেকে হবেন।

ফলতঃ এ কথার শত শত প্রমাণ আছে যে, সে আগমনকারী এ উম্মতের মধ্যেই আসা আবশ্যক এবং বর্তমান শতাব্দীই (হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী) তাঁর আগমনের সময়। **এখন আমি খোদা তা'লার ওহী ও ইলহাম অনুযায়ী ঘোষণা করছি যে, যাঁর আসার কথা ছিল, সে নিশ্চয় আমি।** আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লা নবীদের পরীক্ষার জন্য যে নিয়ম রেখেছেন, তদনুযায়ী যার ইচ্ছা আমার কাছ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করুক ও আমার অনুকূলে যে সকল নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে তা নিরীক্ষণ করুক।

রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ

বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা দেখলে আমার বড়োই দুঃখ হয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যে–সব লক্ষণ পূর্বে তারা নিজেরাই পেশ করত, এখন তা পূর্ণ হওয়ার পর তারা আপত্তি করছে যে, ঐগুলি সঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ– তারা বলে যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের হাদীসটি প্রমাণিত নয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক, ঘটনার দ্বারা খোদা তা'লা যে হাদীসকে সত্য বলে প্রমাণ করেছেন, তাদের মুখের কথায় কি তা মিথ্যা হয়ে যাবে? হায়! তাদের লজ্জাও হয় না যে, তাদের কথার দ্বারা শুধু মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয় না, পরন্তু রসূলে করীম (সা.)-কেও মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করা হচ্ছে। আমার সত্যতায় শুধু চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ নয়, হাজার হাজার প্রমাণ ও নিদর্শন আছে। একটা যদি বাদ দেয়া হয়, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এ কথা কি প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীটি মিথ্যা? হায়! তারা আমার সাথে শত্রুতা করে শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে। আমি এ ভবিষ্যদ্‌বাণী অতি জোরের সাথে পেশ করে থাকি এবং বলি যে, এটা আমার সত্য মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার প্রমাণ। যে হাদীসকে তোমরা অনুমানরূপ কালিতে লিখেছিলে, ঘটনা তাকে নিশ্চয়তায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এটা অস্বীকার করা এখন বেঈমান ও অভিশপ্ত হওয়ার লক্ষণ।

জাল (মওযু) হাদীস সম্বন্ধে মুহাদ্দিসগণ কী বলেন? তাঁরা কি বলেন যে, চোর ধরে ফেলেছেন? তাঁরা কি কেবল এ কথাই বলেন না যে, বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি ভালো ছিল না কিংবা তার সত্যবাদী হওয়া সন্দেহজনক? পক্ষান্তরে এ কথাও স্বীকার করেন যে, কোনো দুর্বল হাদীসের ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন একে সত্য হাদীস বলে গ্রহণ করা কর্তব্য। এ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের হাদীসকে কেউ মিথ্যা বলতে সাহস পাবে কি?

অতএব স্মরণ রেখো, যাঁর আসার ভবিষ্যদ্‌বাণী থাকে তাঁকে নিরপেক্ষ নীতিসমূহের দ্বারা পরীক্ষা করতে হয়। এ পন্থায় তাঁর সত্যতা জানা যায়। যেহেতু উদাহরণ ব্যতীত মানববুদ্ধি কোনো বিষয়ে সম্যক ধারণা করতে পারে না, সেজন্য তার স্বপক্ষে বুদ্ধির বিষয়ীভূত উদাহরণও থাকে। আর সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা এই যে, খোদা তাঁকে সাহায্য করে থাকেন। কারো যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সে আমার সামনে এসে নবীকে পরীক্ষা করার যে নিয়ম আছে তদনুযায়ী আমার সত্য হওয়ার প্রমাণ আমার কাছ থেকে গ্রহণ করুক। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে পলায়ন করব। কিন্তু তা হবার নয়। আল্লাহ্ তা'লা ঊনিশ বছর পূর্বে (বর্তমান সময় থেকে ১২০ বছর পূর্বে– প্রকাশক) আমাকে বলেছেন, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন'।

ইয়ানসুরুকাল্লাহু ফী মাওয়াতিনা

অর্থ: 'আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করছেন এবং করবেন'।

অতএব, নবী ও রসূলদেরকে যেভাবে পরীক্ষা করা হতো আমাকে সেভাবে পরীক্ষা করো। আমি দাবির সাথে বলছি যে, এ প্রণালীতে পরীক্ষা করলে আমাকে সত্যবাদী পাবে। আমি সংক্ষেপে এসব কথা বললাম। চিন্তা করে দেখ! খোদা তা'লার সমীপে দোয়া করতে থাক। তিনি শক্তিমান, তিনি পথ দেখিয়ে দিবেন। তাঁর সাহায্য সত্যবাদীরাই পেয়ে থাকেন।

সমাপ্ত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলেছেন,

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদা তা'লা ব্যতীত কোনো মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি, ফিরিশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরো ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'ত-কে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা '**লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**'-এর ওপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ থেকে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্‌ব্যতীত খোদা তা'লা এবং তার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্যকরণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের ওপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের ইজমা অর্থাৎ সর্ববাদি সম্মত মতো ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, সেসব সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্যকর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোনো দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এ অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এসবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহি আলাল কাযিবীনা ওয়াল মুফতারীনা–"

অর্থাৎ সাবধান! নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। *[আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃ. ৮৬-৮৭]*

AHBAN

Bangla Translation from Urdu

MALFOOZAT

Vol. 2, Page 355-384

Speech delivered by

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian

Promised Messiah & Imam Mahdi[as]

(Al-Hakam. January 10
Upto February 21, 1903)

ISBN 978-984-991-008-4

9789849910084